

মহামায়া

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

মহামায়া

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
১লা জানুয়ারী, ১৯৫০

দাম ঃ দেড় টাকা

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২, হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্বাধীন ভারত প্রেস, ৪৬।২৬ সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীশচীন্দ্রলাল দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচী

নিবেদন

মদনূদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী কলিকাতা উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ইহার চতুর্থ সংস্করণ চলিতেছে। এই চারি সংস্করণে আঠার হাজার চণ্ডী মুদ্রিত হইয়াছে। অসংখ্য পাঠকপাঠিকা আমাকে চণ্ডীতত্ত্ব লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের সপ্রেম ও সনির্বন্ধ অনুরোধে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত। যাঁহারা চণ্ডীর মূল সংস্কৃত শ্লোকাবলী কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়িতে অক্ষম অথচ চণ্ডীর আখ্যায়িকা ও তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্যই এই পুস্তক লিখিত। ইহাতে চণ্ডীর আখ্যায়িকা ও ইতিবৃত্ত, দর্শন ও তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত। ইহা পাঠে চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত সার অনায়াসে অবগত হওয়া যায়। মহামায়াই চণ্ডীর প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। সেইজন্য এই পুস্তকের নাম 'মহামায়া' রাখা হইল। 'মহামায়া', 'চণ্ডীর প্রথম চরিত্র' ও 'রুদ্রচণ্ডী' যথাক্রমে উদ্বোধনের ১৩৪৭ আশ্বিন, ১৩৫৫ আশ্বিন এবং ১৩৫২ শ্রাবণ সংখ্যাত্রয়ে এবং 'বাংলা শাক্ত সাহিত্য' প্রবর্তকের ১৩৫২ আষাঢ় এবং 'বৌদ্ধ ধর্মে শক্তিবাদ' মাসিক বসুমতীর ১৩৩৯ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শক্তিসাধনাই বাঙ্গালী জাতিকে অমর করিয়াছে। বাংলার ঘরে ঘরে চণ্ডীর আলোচনা ও উপাসনা প্রচারোদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রকাশিত। এই দুর্দিনে কাগজ ও মুদ্রন দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও প্রবর্তক পাবলিশার্স-এর অধ্যক্ষ সুহৃদ্বর শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণপূর্বক আমাকে চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সংঘগুরু শ্রদ্ধেয় শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক এই পুস্তকের মর্মবাণী লিখিয়া দিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই পুস্তকের প্রচ্ছদপটের শ্রীশ্রীদুর্গার ছবি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্তি হইতে গৃহীত এবং ইহার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৩৫৫
বেলুড় মঠ, হাওড়া

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

গ্রন্থমর্ম

শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়—এই তিন প্রস্থানত্রয়ের উপরই ভারতের জাতীয়তা নির্ভর করে। অপৌরুষেয় বেদ শ্রুতি, গীতা স্মৃতি এবং বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র ন্যায়শাস্ত্র। ভারতের মস্তিষ্ক গঠিত হইয়াছে এই প্রস্থানত্রয়ের ভিত্তিতে। মহামতি ব্যাসদেব ভারতে ভারতী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জীবনবাদকে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতীয় শিক্ষায় জাতি গড়ার জন্য আশ্রয় করিয়াছিলেন জ্ঞান ও কর্মের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে। তাই ভারতবর্ষের মর্মকথা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দিয়াই তিনি প্রচার করিলেন। কিন্তু গীতা ভাবময় মন্ত্রময় আত্মদর্শনের স্মৃতি জাগ্রত করে মাত্র। তাই তাঁহার পরবর্তী সৃষ্টি শ্রীশ্রীচণ্ডী। ভাবকে বস্তুতন্ত্র করিয়াছে প্রকরণাত্মক চণ্ডী। গীতায় যাহা ভাবের বিগ্রহ, চণ্ডীতে তাহার প্রাণসঞ্চারের বিধান আছে।

মহামতি ব্যাসদেব কেবলমাত্র ভাবের মানুষই ছিলেন না, জ্ঞানকে প্রচার করিয়াই কেবল তিনি ক্ষান্ত হন নাই—কর্ম্মের আশ্রয়ে ভাব-ঘন-মূর্তি গঠনের আয়োজন তিনি সর্ব্বপ্রথমে করিয়াছেন। অখণ্ড ভারত রচনার জন্য একটি অখণ্ড জাতীয়তা প্রচারোদ্দেশ্যে তিনি সর্বপ্রথম ভারত-বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে অপৌরুষেয় বেদবাদের সহিত তিনি অষ্টাদশ পুরাণ বিদ্যারও প্রবর্ত্তন করেন। এই সকল বিদ্যার গোড়ায় যে চতুর্বেদ তাহা জাতির মধ্যে প্রচার মানসে চারিজন সুদক্ষ অধ্যাপকও সৃষ্টি করেন। পিলকে দিয়া একবিংশতি শাখাসমন্বিত ঋগ্বেদ—বৈশম্পায়ণকে দিয়া শতশাখা যজুর্ব্বেদ—জৈমিনীকে দিয়া সহস্র শাখা সামবেদ এবং সুমন্তকে দিয়া নব শাখাসমন্বিত অথর্ব্ব বেদ প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, বেদের মর্ম অবগত হইলে ষড়ঙ্গবেদ, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি স্বতঃই

আসিয়া পড়িবে এবং জীবনের দায়ে অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত ধনুর্ব্বেদ, আয়ূর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববিদ্যা, অর্থশাস্ত্র এই বিদ্যালয়ের সম্পত্তি হইবেই। বেদব্যাস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বয়ং অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া ভারত-পুরাণের মধ্য দিয়া জ্ঞানকে জীবনে অনুবাদিত করার জন্য আরও গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। রৈবতকে গিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইবার ইন্ধন জোগাইলেন। "পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"—এই বাণী মহামতি ব্যাসের অমর লেখনীপ্রসূত। ভারতে ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁহার ন্যায় উদ্যোগী পুরুষ দ্বিতীয় আর নাই।

ব্যাসদেব বেদের ভিত্তিতেই অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। মোক্ষ তিনি অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাহা অনন্ত জীবনের ছেদ কোথাও আনে নাই। তাঁহার গীতাই এই সাক্ষ্য সর্বপ্রথম প্রদান করিয়াছে। এ জাতির যে পঞ্চনীতি তাহা ব্যাসদেবেরই কীর্ত্তি। ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়তো অনেক জাতিই; কিন্তু জ্ঞানের উপর, বিজ্ঞানের উপর ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা দিতেই তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে অপৌরুষেয় বেদমন্ত্র এবং বেদের সার সংগ্রহ করিয়া রচনা করিয়াছেন গীতা। যাহাতে বুদ্ধিভেদ না ঘটে, তাহারই জন্য তিনি বেদপ্রতিষ্ঠিত প্রতিভার সৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে চাহিয়াছেন। তিনি মানব প্রতিনিধি অর্জ্জুনের কর্ণে শ্রীকৃষ্ণরূপ গুরুমূর্তিরূপ মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন: "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে।" বিদ্যাশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত ঈশ্বরশক্তি অবগতির মধ্যে আসিলেই শিক্ষায় এ জাতি শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। তবেই তো এ জাতি বলিতে পারিবে— 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলব্ধা', তবেই তো ব্রহ্মজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ বুঝিবে, 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য

মামেকং শরণং ব্রজ'র কথা। তবেই তো ঈশ্বরযুক্তি লাভ করিয়া ভারতের দিব্য জাতি উদাত্ত কণ্ঠে গাহিবে—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥"

ভারতের জ্ঞান অমৃত বর্ষণ করে। ইহাকে আশ্রয় দিবে কে? আমাদের কর্মময় জীবন। গীতায় গুণকর্ম বিভাগে চাতুর্বণ্যের সৃষ্টির কথা আছে। গীতায় ঈশ্বর-বিশ্বাস, বেদ-বিশ্বাস, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস, কর্ম্মবাদ এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেদব্যাস শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই গুণকর্ম্ম বিভাগ চাতুবর্ণ্য সৃষ্টির প্রকরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মানুষের সাধনা—জীবন শেষ করিয়া মুক্তির জন্য নহে। বেদই অনন্ত জীবন। ঈশ্বর, আত্মা, কর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম আদি এ জাতি যেদিন গ্রহণ করিবে ভারতের পরিপূর্ণ সাফল্য সেই দিনই হইবে। ভারতের সন্তান উচ্চ কণ্ঠে বলিবে, 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

ভারতের ব্রাহ্মণ সেই দিন অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে দিন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার চতুরাম্নায় চতুর্ব্বেদ স্ফুরিত হইয়াছে। ভারত যে ব্রহ্মণ্য প্রতিভার সিদ্ধতীর্থ, তাহা অস্বীকার করার সাধ্য কাহারও নাই। যে ব্রাহ্মণ মনু মহারাজের উক্তিতে—

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তি ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
যা হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

—এই ব্রাহ্মণ ভারতে জন্ম গ্রহণ করার ফলেই অসংখ্য দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়াও ভারত অপহৃতচৈতন্য হয় নাই। এই জন্যই ভারতের জ্ঞান-গরিমার মূল্য কোন জাতিই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

ভারতের বুদ্ধি ব্রহ্মণ্য প্রতিভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের ধর্ম কিন্তু ভাগবত হইল কি? প্রাণের ধর্ম ভাগবত প্রেরণায় জাগ্রত

হইল কোথায় ? ভারতের প্রস্থানত্রয় হৃদয় ও প্রাণের শোধন তো আনিল না, বেদব্যাস তাই রচনা করিলেন শ্রীশ্রীচণ্ডী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই প্রচেষ্টার অপূর্ব্ব সাধনতত্ত্ব আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। যে দেশ সর্ব ধর্ম বর্জনের অধ্যবসায়শীল, সে দেশ কি আজিও ধর্ম-মত্ততায় অধীর হইবে ? আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে হৃদয়ের ধর্ম রাজা সুরথে বিগ্রহান্বিত হইতে দেখি। প্রাণের ধর্ম বৈশ্যে প্রতিভাত হইয়াছে। হৃদয় ও প্রাণের দিব্য রূপান্তর-সাধনতত্ত্ব ভারতের সিদ্ধ ব্রাহ্মণ মেধস মুনির আশ্রয়েই মিলিয়াছে। ভারতে ব্রাহ্মণ মূর্ত হইয়াছে। হৃদয়ের ক্ষাত্র শক্তি সুরথকে সাবর্ণি সূর্যতনয় মনুতে পরিণত করিতে পারে নাই। আর "নির্ব্বিন্নমানসঃ সঙ্গবিচ্যুতিকাবকম্" যে বৈশ্য তাহাতে গড়িয়া উঠে নাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মর্ম গীতার "চাতুর্ব্বর্ণ্য ময়া সৃষ্টম্ গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ" মন্ত্র সিদ্ধ করারই প্রকরণ। আমরা মানুষকে গড়িয়া তুলিব চতুর্গুণবিশিষ্টরূপে। মেধা এ জাতি লাভ করিয়াছে। চাই বিশুদ্ধ রাষ্ট্রশক্তি—নির্ব্বিন্ন চিত্তে ধন-সৃষ্টি। সেবা তবেই নিরাসক্ত হইয়া এ জাতির অনুগমন করিবে।

মস্তিষ্কের অনুশীলন ভারতে সিদ্ধ হইয়াছে। হৃদয় ও প্রাণের পরিশুদ্ধির জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রচার ঘরে ঘরে বাঞ্ছনীয়। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের প্রচেষ্টা এই দিক দিয়া সার্থক হউক—ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা।

চন্দননগর
১লা জানুয়ারী '৫০

শ্রীমতিলাল রায়
প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ

এক

মহামায়া

মহামায়া সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু। তন্ত্রশাস্ত্রের সারস্বরূপা শ্রীশ্রীচণ্ডীর তিনটী চরিত্রে পৃথক্‌ভাবে এই মহামায়াতত্ত্বই সবিস্তার ব্যাখ্যাত। মহামায়া শব্দটী চণ্ডীতে আট বার (১।৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬০, ৭০, ৯৪ এবং ১১।১২ মন্ত্রে) উল্লিখিত হইয়াছে। চণ্ডীর নাগোজীভট্টী টীকা ও তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার মতে যথাক্রমে মহামায়া বিসদৃশ-প্রতীতি-সাধিকা ঈশ্বর-শক্তি এবং অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্ম-শক্তি। এই মহাশক্তির দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি, সংহার ও জন্মলীলাদি কার্য্য করেন। জীবের বন্ধন ও মুক্তি মহামায়ার ইচ্ছাধীন। ইনিই উপাসকগণের কল্যাণের জন্য অভৌতিক রূপ ধারণ করিয়া দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিতা হন। দেবীভাগবতের ৫ম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে মহামায়ার স্বরূপ এই ভাবে বলিতেছেন ঃ

যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপোস্বভাবোঽপি লোকরঞ্জনহেতবে ॥ ৫৮
তথৈষা দেবকার্য্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণানি চ ॥ ৫৯

অর্থাৎ স্বভাবতঃ নটের রূপ এক হইলেও যেমন লোকরঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী অরূপা হইয়াও দেবতাদিগের কার্য্য সম্পাদনের জন্য স্বীয় মায়ায় সত্ত্বাদিগুণসমন্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন।

দেবীভাগবতে মহামায়াকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবতীও বলা হইয়াছে। রুদ্রযামলের মতে মহামায়াই পরব্রহ্ম। যথা, 'ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।" বাঙ্গালার তন্ত্রসাধকগণও উক্তমতাবলম্বী। শ্রীরামপ্রসাদ বলেন—'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—'যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী।' দেবীপুরাণে এবং কালিকা-পুরাণে মহামায়ার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কালিকাপুরাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে—

গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ ॥
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্ ॥ ৬১
পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কারসঙ্ঘাতেন নিয়োজ্য চ।
আহরাদৌ ততো মোহমমত্বজ্ঞানসংশয়ম্ ॥ ৬২
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্তা ক্ষিপ্তা পুনঃ পুনঃ।
পশ্চাৎ কামেন সংযোজ্য চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্ ॥ ৬৩
আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী ॥ ৬৪

অর্থাৎ মাতৃগর্ভে প্রত্যেক জীব তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত থাকিলেও প্রসূতিপবনে প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য করেন; আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারবলে আহারাদি কার্য্যে সতত প্রবৃত্ত এবং মোহ, মমতা ও সংশয়ে আবদ্ধ করেন; যিনি জীবকে পুনঃ পুনঃ ক্রোধ, লোভ ও মোহ মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই চিন্তাকুল জীবকে নিরন্তর কামস্রোতে ডুবাইয়া আমোদযুক্ত ও ব্যসনাসক্ত করেন তাঁহারই নাম মহামায়া এবং সেই শক্তির জন্যই তিনি জগদীশ্বরী। চণ্ডীমতে মহামায়ার তামসী মূর্ত্তি মহাকালী, রাজসী মূর্ত্তি মহালক্ষ্মী ও সাত্ত্বিকী মূর্তি মহাসরস্বতী। চণ্ডীর গুপ্তবতী টীকার মতে উক্ত দেবীত্রয়ের গুণ ও রূপ বিভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহারা অভিন্ন। দেবীভাগবতও

(১২।১৯-২০) উক্ত মত সমর্থন করিয়া বলেন—

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাঽবিকৃতা শিবা।
যোগগম্যাঽখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা ॥
তস্যাস্তু সাত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

অর্থাৎ যিনি সদা নির্গুণা, নিত্যা, ব্যাপিকা, অপরিণামিনী ও শিবা এবং যিনি ধ্যানগম্যা, বিশ্বাধারা ও তুরীয়া রূপে সংস্থিতা, তাঁহারই সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী শক্তিই যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী।

চণ্ডীর শান্তনবী টীকানুযায়ী এই মহামায়াই সাংখ্যদর্শনমতে প্রধানাখ্যা প্রকৃতি, বেদান্তমতে অনির্ব্বচনীয়া অনাদি অবিদ্যা, শাব্দিকমতে শব্দশক্তি, তান্ত্রিকমতে কর্ম্মসমূহের অপূর্ব্বোৎপাদন-সামর্থ্য-লক্ষণা ফলগতি, তার্কিকমতে বস্তুতত্ত্বাবসিতি সিদ্ধিভেদ, শৈবমতে শিবশক্তি, বৈষ্ণবমতে বিষ্ণুমায়া, পৌরাণিক মতে দেবী এবং শাক্ত মতে মহামায়া। মহামায়া, যোগমায়া, বিষ্ণুমায়া ও যোগনিদ্রা শব্দচতুষ্টয় তন্ত্রশাস্ত্রে সমানার্থক দেখা যায়। যোগমায়া শব্দটী চণ্ডীতে নাই, তবে গীতায় একবার মাত্র আছে। চণ্ডীতে বিষ্ণুমায়া শব্দটী তিন বার (৫।৭, ১৪ এবং ১৩।৩ মন্ত্রে) ও যোগনিদ্রা শব্দটী চার বার (১।৫৪, ৬৬, ৬৯, ৭১ মন্ত্রে) উল্লিখিত। কালিকাপুরাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মা মদনের প্রশ্নোত্তরে যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়ার তত্ত্ব নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তরূপেণ রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।
বিভজ্য যার্থং কুরুতে বিষ্ণুমায়েতি সোচ্যতে ॥ ৫৮
যা নিম্নান্তঃস্থলাধঃস্থা জগদণ্ডকপালতঃ।
বিভজ্য পুরুষং যাতি যোগনিদ্রেতি সোচ্যতে ॥ ৫৯

অর্থাৎ যিনি অব্যক্তকে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই তিন ভাবে

ব্যক্তরূপে বিভক্ত করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করেন, তাঁহার নাম বিষ্ণু-মায়া। আর যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, মধ্য ও অধোদেশে অবস্থিত হইয়া পুরুষকে তাহা হইতে পৃথক করিবার পর স্বয়ং অপসৃতা হন তিনিই যোগনিদ্রা।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ২৫শ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, তিনি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত থাকেন বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হন না। উক্ত শ্লোকে যোগমায়া শব্দের অর্থ আনন্দ-গিরির মতে অনাদি অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান, শ্রীধর স্বামীর মতে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া এবং শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর মতে আত্মার সংকল্পানু-বিধায়িনী মায়া। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যে (৭।২৫) যোগমায়া শব্দের অর্থ এই ভাবে করিয়াছেন—"যোগো গুণানাং যুক্তির্ঘটনং সা এব মায়া যোগমায়া।" নীলকণ্ঠী ব্যাখ্যামতে যোগমায়া ভগবৎসংকল্পবশ-বর্ত্তিনী শক্তি। মহামায়া তত্ত্বটী স্বদেশে ও বিদেশে নানা ভাবে কিরূপে গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে তাহা অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'মহামায়া' নামক বৃহৎ ইংরাজি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মহামায়া কাত্যায়নাশ্রমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডীতে তিনি কাত্যায়নী নামে অভিহিতা। কাত্যায়নী শব্দটী চণ্ডীতে বহু বার উল্লিখিত। এই কাত্যায়নী ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্রজাঙ্গনাগণ মনোমত পতিলাভের জন্য তাঁহার আরাধনা করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যোগমায়া ও বিষ্ণুমায়া শব্দের বহু বার উল্লেখ আছে। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে আছে যে, ভগবান্ দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপে জাত হইবার পূর্ব্বে যোগমায়াকে নন্দ-পত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, ও ভ্রান্তিরূপে সর্ব্বভূতে তিনি বিরাজমানা। তিনি সূর্য্যাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের

অধীশ্বরী দেবী ও সর্ব্ববস্তুতে জড়শক্তিরূপে অবস্থিতা এবং সমগ্র স্থূল ও সূক্ষ্ম, দৃশ্য ও অদৃশ্য বিশ্বে ব্যাপ্তা। তিনি ভক্তগণের প্রতি অতি সৌম্যা ও ধর্ম্মদ্বেষিগণের প্রতি ততোধিক রুদ্রা। তিনি জ্যোৎস্নারূপিণী ও ইন্দুরূপিণী গৌরী। তিনি সর্ব্বাণী ও সর্ব্বকারিণী। তিনি বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মী ও মাহেশ্বরী এবং জগতের প্রতিষ্ঠারূপিণী।

কালিকাপুরাণের পঞ্চম অধ্যায়ে এবং চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্তৃক মহামায়ার দুইটি সুন্দর স্তব আছে। চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে বলিতেছেন, 'মহামায়া নিত্যা ও সনাতনী, আবির্ভাবশূন্যা ও তিরোভাব-রহিতা। এই জগৎপ্রপঞ্চই তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি। তথাপি তিনি দেবগণের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য এবং ভক্তগণের সংরক্ষণের জন্য জগতে আবির্ভূতা হন। যখনই মানুষ বিপদাপন্ন হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবে তিনি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিবেন—এই অভয়-বাণী তিনি তাঁহার মানব-সন্তানকে চণ্ডীমুখে প্রদান করিয়াছেন। মহামায়া তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বদেশে রক্ষা করিয়া আসিতে-ছেন। 'কবিকঙ্কন চণ্ডী'তে দেখা যায়, শ্রীমন্ত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া যখন দেবীকে স্মরণ করিয়াছিল তখন তিনি শ্মশানে আবির্ভূতা হইয়া ভক্তের জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রপন্নার্ত্তিহরা ও শরণা-গতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণা নাম সার্থক করিয়াছিলেন। শুম্ভবধের পর দেবতাগণ কাত্যায়নী দেবীকে যে স্তব করিয়াছিলেন তাহা চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। সেই স্তবের সার মর্ম্ম এই:

"হে অখিল জগতের জননী ও চরাচরের ঈশ্বরী, তুমি প্রসন্না হও। তুমি একাকিনীই জগতের আধারভূতা এবং মহীস্বরূপে অবস্থিতা। তুমি বৈষ্ণবীশক্তি, এবং অলঙ্ঘ্যবীর্য্যা অনন্তশক্তি পরমা মায়া।

তুমিই জলরূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া নিখিল জগতের পোষণ করিতেছ। পরা ও অপরা সকল বিদ্যাই তোমার অংশ। অদ্বিতীয়া তুমিই নিখিল বিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছ। তুমিই জীবকে মমতাবর্ত্তে ও মোহগর্ত্তে নিক্ষেপ কর, আবার তুমিই প্রসন্না হইলে ভক্তকে স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান কর। তুমি পরিণামপ্রদায়িনী সর্ব্বার্থসাধিকা নারায়ণী। তুমি সর্ব্বমঙ্গলেরও মঙ্গলরূপিণী এবং সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের শক্তিভূতা সনাতনী, গুণাশ্রয়া এবং অগুণময়ী। তুমি ব্রহ্মাণী, কৌমারী, মাহেশ্বরী, সরস্বতী, বারাহী, নারসিংহী ও ঐন্দ্রী। তুমি সহস্র নয়নোজ্জ্বলা, সহস্রভুজা ও সহস্রবদনা বিশ্বব্যাপিনী দেবী। তুমি দংষ্ট্রাকরালবদনা, শিরোমালাবিভূষণা চামুণ্ডা। হে সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা দেবী, আমাদের সকল প্রকার ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। তুমি পরিতুষ্টা হইলে অশেষ উপদ্রব দূর কর এবং রুষ্টা হইলে অশেষ অভিলষিত বস্তু নাশ কর। যাঁহারা তোমার আশ্রিত তাঁহাদের কখনও বিপদ হয় না বরং তাঁহারাই সকলের আশ্রয়নীয় হন। হে দেবী, বিবেকপ্রদীপের আলোকে শ্রুতিস্মৃতিতন্ত্রাদি শাস্ত্র প্রোজ্জ্বল থাকা সত্ত্বে মহান্ধকার মমত্বগর্তে জীবগণকে ভ্রমণ করাইতে তুমি ভিন্ন আর কে সমর্থ? জননী, তুমি প্রণতগণের প্রতি প্রসন্না এবং ভক্তগণের প্রতি অভীষ্টদাত্রী হও।"

মহিষাসুরবধের পর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহামায়ার যে স্তব করিয়াছিলেন তাহা চণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত আছে। উক্ত স্তবের সার মর্ম এই যে, যিনি স্বীয়শক্তি দ্বারা এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ও যিনি নিখিল দেবগণের শক্তিসমূহের প্রতিমূর্ত্তি, ও অখিল দেবগণ ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া তিনিই চণ্ডিকা। কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানা, শারদা ও অম্বিকা নামে তিনি ভাগবতে অভিহিতা। ভাগবতের বৈষ্ণবতোষিণী টীকার মতে

"যোগমায়ৈব যোগনিদ্রা নিদ্রাবৎ সকললোক-বোধহরণাৎ"। অর্থাৎ নিদ্রার ন্যায় সকল লোকের জ্ঞান হরণ করেন বলিয়া যোগমায়াই যোগনিদ্রা। এই গ্রন্থের ১০ম স্কন্ধে (১।১৮ শ্লোকে) বিষ্ণুমায়ার এইরূপ বিবরণ আছে। যথা—'বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর ভগবতী মায়াই জগৎ সম্মোহিত করেন। ভাগবতের বিখ্যাত টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যোগমায়া ও মহামায়ার মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে যোগমায়ার অংশ ও আবরিকা শক্তিই মহামায়া। রাসলীলাদি সিদ্ধির জন্য ভগবৎপ্রেয়সীগণের পতিশ্বশ্রাদিমোহনাদি যোগমায়ার কার্য্য এবং দেবকীর কন্যারূপে কংসবঞ্চনাদি মহামায়ার কার্য্য। চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বীয় মত পরিপুষ্টির জন্য ভাগবতের তৎকৃত সারার্থ-দর্শিনীটীকাতে নারদপঞ্চরাত্রগ্রন্থের শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদ হইতে নিম্নলিখিত চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মন।
মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বর॥
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥

অর্থাৎ "একা পরাশক্তিই কান্তকে জানেন, তদাত্মিকা তিনিই দুর্গা। সেই যোগমায়া মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী, সর্বশ্রেষ্ঠা ও পরমাশক্তি। তাঁহার বিজ্ঞান-মাত্র দ্বারাই মুহূর্ত্তমধ্যে শ্রেষ্ঠগণের শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা-দেবতার প্রাপ্তি হয়, অন্য উপায়ে নহে। অদ্বিতীয়া প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরীর কৃপায়

আদিদেব অখিলেশ্বরের দর্শন সুলভ। এই যোগমায়ার আবরিকা শক্তিই অখিলেশ্বরী মহামায়া। সকল দেহাভিমানী জন্তু ও জীব এবং সমগ্র জগৎকে মহামায়া মোহগ্রস্ত রাখিয়াছেন।” মথুরায় যোগমায়া দেবীর মন্দির আছে।

চণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ের ৪১ ও ৪২ মন্ত্রদ্বয়ে মহামায়া দেবগণকে বলিতেছেন যে, তিনি বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিসংখ্যক চতুর্যুগের দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে নন্দগোপ-গৃহে যশোদার গর্ভে উৎপন্না হইয়া বিন্ধ্যাচলবাসিনীরূপে অসুর নাশ করিবেন। ভগবান যোগমায়াকে শ্রীকৃষ্ণজন্মের পূর্ব্বে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে উৎপন্না হইতে আদেশ দিয়াছিলেন—শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্য সমর্থনের জন্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার টীকাতে চণ্ডীর উপরোক্ত মন্ত্রদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চণ্ডীতে মহামায়ার চরিত্রের যে বিভিন্ন ধ্যান আছে তাহাতে মহাকালীকে দশভুজা, মহালক্ষ্মীকে অষ্টাদশভুজা এবং মহাসরস্বতীকে অষ্টভুজারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বৈকৃতিক রহস্যের মতে ‘অষ্টাদশভুজা সেব্যা সা সহস্রভুজা সতী’। অর্থাৎ মহামায়ার মহালক্ষ্মীরূপ সহস্রভুজা হইলেও তাঁহাকে অষ্টাদশভুজারূপে পূজা ও ধ্যান করিবে। উপরোক্ত শ্লোকার্দ্ধের ‘সহস্র’ শব্দ অনন্তবাচী। সুতরাং দেবী প্রকৃতপক্ষে অনন্তভুজা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিনী। চণ্ডীর অন্য এক স্থলে মহামায়াকে সহস্রনয়না বলা হইয়াছে। উর্দ্ধ, অধঃ, জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, অনলে, অনিলে সর্ব্বত্র তিনি বিদ্যমানা। চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে দেবতাগণ মহামায়াকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, “চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, মাতা, তুষ্টিরূপা দেবীকে আমরা ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। মহামায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী। কারণ সৃষ্টি,

স্থিতি ও সংহারের ঈশ্বরত্রয়কে তিনিই শরীর গ্রহণ করাইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব এই মহামায়ার প্রভাব ও শক্তির ইয়ত্তা করিতে অক্ষম। দেবীপুরাণমতে 'ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রি পরমেশলয়াত্মিকা'। অর্থাৎ মহামায়া রাত্রি দেবী ব্রহ্মস্বরূপিণী, তাঁহাতে ব্রহ্মারও লয় হয়। তিনি কালরাত্রি, কারণ তাঁহাতেই কালেরও লয় হয়। তিনি মহারাত্রি বা প্রলয়রাত্রি, কারণ তিনি জগতের লয়স্থান এবং তিনিই মহা-মোহ-নিশা মহারাত্রি। কারণ নিদ্রারূপে জীবের নিত্যলয়ের স্থান একমাত্র তিনি। হে দেবী, তুমি কৃপা করিয়া অশুভ সংহার ও শুভসৃষ্টির জন্য ইচ্ছা কর। হে দেবী, তুমি সুকৃতিশীলগণের ভবনে স্বয়ং শ্রীরূপা আবার পাপাত্মাগণের গৃহে অলক্ষ্মীরূপা এবং তুমি সজ্জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও সৎকুলজাত ব্যক্তিগণের অন্তরে লজ্জারূপা। এতাদৃশী তোমাকে প্রণাম করি। তুমি মনোবুদ্ধির অগোচর। সুতরাং তোমার মাহাত্ম্য কিরূপে বর্ণনা করিব? তুমি সমস্ত জগতের হেতু ও ত্রিগুণা। তুমি সৃষ্টিস্থিতিসংহার করিলেও অনুরাগবিরাগাদি দোষ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি আদিহীন ও অন্তহীন, অতএব হরিহরাদিরও অনধিগম্যা। তুমি পরমা প্রকৃতি ও আদ্যা দেবী। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমার অংশভূত। সমস্ত যজ্ঞে যে স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণে দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন, তুমিই সেই স্বাহা। পিতৃলোকের তৃপ্তির হেতুভুত স্বধামন্ত্রও তুমিই। যে ব্রহ্মবিদ্যা মুক্তির হেতু সেই মহাবিদ্যাই তুমি; এইজন্য মুমুক্ষুগণ ও জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। বিপদে তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি সঙ্কট হইতে ত্রাণ কর এবং সাধকগণ তোমাকে অনুধ্যান করিলে তুমি তাঁহাদিগকে মোক্ষবুদ্ধি প্রদান কর। চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্তৃক মহামায়ার উক্ত হইয়াছে যে, দেবী সত্ত্বরজতমে গুণময়ী, প্রণবরূপা, সাবিত্র-রূপা ও গায়ত্রীরূপা। তিনি মহা বিদ্যা ও মহা অবিদ্যা। তিনি মহাস্মৃতি

ও মহা অস্মৃতি। তিনি মহাদেবী ও মহা অসুরী। জগতে যত প্রকার সৎ ও অসৎ শক্তি আছে তাহা তিনিই। তিনি সৌম্যা, সৌম্যতরা ও অশেষসৌম্য হইতেও অতি সুন্দরী। চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে মেধাঋষি রাজা সুরথ ও সমাধিকে বলিতেছেন—

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা॥
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

* * * *

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥

অর্থাৎ সেই মহামায়া বিবেকিগণের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাচ্ছন্ন করেন। সেই তিনি প্রসন্না হইলে মানুষকে মুক্তি-দানের জন্য বরদাত্রী হন।

মহামায়া বিশ্বব্যাপিনী হইলেও নারীর মূর্ত্তিতে তাঁহার সমধিক প্রকাশ। অল্পবয়স্কা কন্যাতুল্যা, সমবয়স্কা ভগ্নীতুল্যা বা বয়োবৃদ্ধা জননী-তুল্যা সকল নারীই মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ। প্রত্যেক নারী-মূর্ত্তিতে মাতৃবুদ্ধি ও প্রত্যেক নারীকে জগন্মাতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তিনি অত্যন্ত সন্তানবৎসলা। তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিলেই তিনি অবিলম্বে প্রসন্না হন। তিনি ইচ্ছা-ময়ী। তাঁহার ইচ্ছাতেই জগতের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সকল ঘটনা ঘটিতেছে। কেহই তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ নয়। হে পাঠকপাঠিকাগণ, আসুন আমরা শিশুর ন্যায় সরলভাবে মহামায়ার চরণে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক মাতৃনাম মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে এই ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। ওঁ মা।

দুই

চণ্ডীর ভূমিকা

তন্ত্রশাস্ত্র বিশাল। হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রেরও অসংখ্য গ্রন্থ আছে। চীনদেশীয় ত্রিপিটকে (বৌদ্ধশাস্ত্রে) চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নালন্দা ও বিক্রমশিলা নামক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। মহাসিদ্ধ-সার তন্ত্রমতে ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগে বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা এই তিন ক্রান্তাতে বিভক্ত ছিল। শক্তিমঙ্গল তন্ত্রমতে বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে পূর্ব্ব দিকে জাভাদ্বীপ পর্য্যন্ত সকলদেশ বিষ্ণুক্রান্তা নামে, বিন্ধ্য-পর্ব্বত হইতে উত্তর দিকে মহাচীন পর্যন্ত রথক্রান্তা নামে এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে পশ্চিমে পারস্য, মিশর ও রোডেসিয়া প্রভৃতি দেশ অশ্বক্রান্তা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রত্যেক ক্রান্তাতে ৬৪ খানি তন্ত্রের প্রচার ছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ চৌষট্টিখানি হিন্দুতন্ত্রোক্ত প্রধান প্রধান সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

মূলকল্পতন্ত্র ও গুহ্যসমাজতন্ত্র নামক দুইখানি প্রাচীনতম বৌদ্ধতন্ত্র যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়। অনেকের অনুমান প্রপঞ্চসার তন্ত্রখানি শঙ্করাচার্য্যের রচনা এবং উক্ত তন্ত্রের উপর আচার্য-দেবের শিষ্য পদ্মপাদের একটি টীকাও আছে। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের সারতত্ত্ব চণ্ডীর মধ্যে নিহিত। সেইজন্য তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীশ্রীচণ্ডী অতি সারবান ও সমাদৃত গ্রন্থ। গীতার ন্যায় উহা হিন্দুর নিত্য-পাঠ্য। ভারতের একান্নটী পীঠস্থানে বা শক্তিসাধনার কেন্দ্রে

চণ্ডী নিয়মিতভাবে পঠিত হয়। চণ্ডীপাঠ দুর্গাপূজার প্রধান অঙ্গ। হিন্দুদের প্রিয় এই ধর্ম্মগ্রন্থ চণ্ডীখানি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণেরও প্রিয় ছিল। জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বহস্তে লিখিত একখানি চণ্ডী নেপালে পাওয়া গিয়াছে। উহা প্রায় এক সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত।

সার জন উড্‌রফ সাহেবের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় বহু তন্ত্র ইংরাজী ভাষায় অনূদিত এবং তন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যেও ইদানীং চণ্ডীর সমাদর দিন দিন বাড়িতেছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক এফ-ইডেন পার্জিটার সাহেব সমগ্র মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও তদন্তর্গত চণ্ডী ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। গীতা যেমন মহাভারতের অংশ, চণ্ডী তদ্রূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নামই 'চণ্ডী'। দেবীমাহাত্ম্য ও দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডীর অপর দুইটি নাম। ইহাতে সাত শত মন্ত্র অথবা প্রায় ৫৭৮টি শ্লোক আছে। রুদ্রযামল তন্ত্রের 'রুদ্রচণ্ডী' এবং বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক' দেবীমাহাত্ম্য অবলম্বনেই রচিত। বাঙ্গালী পণ্ডিত শরণদেব ১১৭২খ্রীঃ ব্যাকরণ-বিচারের জন্য চণ্ডী হইতে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দশম শতাব্দীতে প্রাচীন নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত একখানি চণ্ডী পাইয়াছেন। ডক্টর ভাণ্ডারকর বলেন, সপ্তম শতাব্দীর 'গথ মঙ্গলইড' (Goth-mongloid) অক্ষরের লিপিতে চণ্ডীর প্রসিদ্ধ শ্লোক 'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে....' লিখিত হইয়াছিল। দণ্ডী, ভবভূতি ও বাণভট্ট তাঁহাদের গ্রন্থে চণ্ডীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উপরোক্ত পার্জিটার সাহেবের মতে চণ্ডী খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। অতএব প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্র 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' ও 'চণ্ডী' একই শতাব্দীতে উৎপন্ন। বারাহীতন্ত্র, স্কন্দপুরাণ,

দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, বামনপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণাদিতে চণ্ডীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। চণ্ডীর অষ্টম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে মৌর্য্য শব্দ এবং প্রথম অধ্যায়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে যবন শব্দ উল্লিখিত। সুতরাং চণ্ডী সম্ভবতঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত। চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রক্ষিপ্ত নহে। উহা উক্ত পুরাণের প্রকৃত অংশ। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর নানা যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

কাহারও কাহারও মতে চণ্ডী নর্ম্মদা অঞ্চলে বা উজ্জয়িনীতে উৎপন্ন। কিন্তু অধ্যাপক ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা উক্ত মত খণ্ডনপূর্বক প্রমাণ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ বাংলাদেশ চণ্ডীর জন্মস্থান। ভারতবর্ষে প্রচলিত গৌড়ীয়, কেরলীয়, কাশ্মীরী ও বিলাসী এই চারি প্রকার তন্ত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ীয় মতের প্রাচীনতা ও প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পালরাজাদের সময় বাংলায় তন্ত্রের বিপুল প্রভাব ছিল। একটী তন্ত্রে আছে—'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা'। অর্থাৎ গৌড়ে (বঙ্গদেশে) তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। বরদাতন্ত্রের ১০ম পটলে বাংলা অক্ষরের বর্ণনা আছে। আবার, অধিক সংখ্যক প্রাচীন পীঠস্থানগুলি বঙ্গভূমিতেই অবস্থিত। বাংলার অধিকাংশ ভূভাগ দীর্ঘকালের জন্য জঙ্গলপূর্ণ ছিল। এই সকল জঙ্গলের আদিম অধিবাসীগণকে 'কিরাত' বা 'শবর' বলিত। কাদম্বরী, হরিবংশ, দশকুমার চরিত, ভবিষ্যোত্তর পুরাণ ও কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের অভিমত এই যে, চণ্ডী-বর্ণিত দেবতা কিরাত ও শবরগণের উপাস্যা দেবী ছিলেন। সুতরাং কিরাতদেশেই অর্থাৎ বাংলা দেশেই চণ্ডীর আবির্ভাব বলিয়া মনে হয়। পুরাণের অংশ হইলেও চণ্ডী তন্ত্রশাস্ত্ররূপে গৃহীত। যখন প্রধান প্রধান সকল তন্ত্রই বাংলায় উৎপন্ন তখন চণ্ডীও সম্ভবতঃ বাংলায়ই উদ্ভূত। এই মতের অনুকূলে আর একটি বলবান্

যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। চণ্ডীর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে আছে—সুরথ ও সমাধি মহামায়ার 'মহীময়ী' মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। মহীময়ী মূর্ত্তি বাংলাদেশে প্রচলিত মৃন্ময়ী প্রতিমা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে মৃন্ময়ী প্রতিমায় দুর্গাপূজার প্রচলন নাই। অন্যান্য প্রদেশে ধাতু, কাষ্ঠ বা প্রস্তরে নির্ম্মিত মূর্ত্তিপূজাই সমধিক প্রচলিত।

অধ্যাপক স্বর্গত অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে বাংলার প্রতিমায় দুর্গাপূজা অন্ততঃ এক সহস্র বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। জনসাধারণের বিশ্বাস, প্রতিমায় দুর্গাপূজা নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারাই আরম্ভ হয়। কিন্তু এই প্রবাদ ভিত্তিহীন। আলিবর্দি খাঁ এবং তৎপৌত্র সিরাজউদ্দৌল্লার সমসাময়িক ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু বাংলার উক্ত নবাবদ্বয়ের শাসনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙ্গালী স্মৃতি নিবন্ধকার রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হন। রঘুনন্দনের 'দুর্গোৎসব তত্ত্ব' ও 'দুর্গাপূজা তত্ত্ব' নামক মৌলিক গ্রন্থদ্বয়ে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পূর্বতন পণ্ডিতগণ ও প্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের অনেক কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ হইতেও বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। মিথিলার প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার 'ক্রিয়াচিন্তামণি' গ্রন্থে বাসন্তীদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাচস্পতি রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি তাঁহার 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থে (১৪৭৯ খ্রীঃ) মৃন্ময়ী মূর্তির পূজাপদ্ধতির বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও উক্ত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না তথাপি তৎপ্রদত্ত পূজাপদ্ধতি বর্তমানে বহু শাক্ত পরিবারে চলিয়া আসিতেছে। রঘুনন্দনের

গুরু শ্রীনাথের 'দুর্গোৎসব বিবেক' গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতির আলোচনা পাওয়া যায়। শূলপাণি তাঁহার 'দুর্গোৎসব বিবেক' ও 'বাসন্তীবিবেক' এবং জীমূতবাহন তাঁহার 'দুর্গোৎসবনির্ণয়' গ্রন্থে মৃন্ময়ী পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদ্বয় পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন। শূলপাণি তাঁহার পূর্ববর্তী স্মৃতিনিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। বাংলার প্রাচীনতম স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট কর্তৃক তাঁহার গ্রন্থে জীকন, বালক ও শ্রীকরের বহু বাক্য উদ্ধৃত। জীকন ও বালক বাংলার সেনরাজাদেরও পূর্ববর্তী ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্মদেবের প্রধান মন্ত্রী। সুতরাং উপরোক্ত প্রমাণসমূহ হইতে নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, প্রতিমায় দুর্গাপূজা বাংলাদেশে দশম বা একাদশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল।

গীতার ন্যায় চণ্ডীরও প্রায় ত্রিশটি টীকা আছে। আত্মারাম ব্যাস, আনন্দ পণ্ডিত, একনাথ ভট্ট, কামদেব, কাশীনাথ, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, গোপীনাথ, গোবিন্দরাম, গৌড়পাদ, গৌরীবর চক্রবর্তী, জগদ্ধর, জয়নারায়ণ, জয়রাম, নারায়ণ, নৃসিংহ চক্রবর্তী, পীতাম্বর মিশ্র, ভগীরথ, ভাস্কর রায়, ভীমসেন, রঘুনাথ মস্করী, রবীন্দ্র, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, রামানন্দ তীর্থ, ব্যাসাশ্রম, বিদ্যাবিনোদ, বৃন্দাবন শুক্ল, বিরূপাক্ষ, শঙ্কর শর্ম্মা ও শিবাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ চণ্ডীর উপর টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহাদের টীকাবলীর হস্তলিখিত গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। বাংলার বিখ্যাত শাস্ত্রানুবাদক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের 'দেবীভাষ্য' নামে টীকাখানি অতি বিশদ। বাঙ্গালী পণ্ডিত শ্রীগোপাল চক্রবর্তীর 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক টীকাও হৃদয়গ্রাহী। উক্ত টীকাদ্বয় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভাস্কর রায়ের গুপ্তবতী টীকা, নাগোজী ভট্টের টীকা, জগচ্চন্দ্রিকা টীকা, দংশোদ্ধার টীকা, শন্তনবী টীকা ও

চতুর্ধরী টীকা—এই ছয়টী টীকার সহিত চণ্ডীর একটী উপাদেয় সংস্করণ বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত। বরিশালের সত্যদেব ঠাকুর বিরচিত চণ্ডীর বাংলা ভাষ্য 'সাধন সমর' অতি চমৎকার ও মৌলিক।

মহামায়া-তত্ত্বই সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্রশাস্ত্রের সারস্বরূপা চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়ও মহামায়ার স্বরূপ। মদনূদিত চণ্ডীর পাদটীকায় নানা স্থলে মহামায়ার মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণিত এবং বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র হইতে উপযুক্ত বাক্যোদ্ধারপূর্ব্বক ব্যাখ্যাত। মহামায়া তত্ত্বটী স্বদেশে ও বিদেশে নানাভাবে কিরূপে আলোচিত ও প্রচারিত হইয়াছে তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'মহামায়া' নামক তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের 'মা' নামক গ্রন্থখানিও চণ্ডী-তত্ত্বের একটী সুললিত মৌলিক ব্যাখ্যা। মহামায়া শব্দটী চণ্ডীতে বহু বার ব্যবহৃত। চণ্ডীতে যোগমায়া শব্দটীর উল্লেখ একবারও নাই। কিন্তু মহামায়া শব্দের পরিবর্ত্তে যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া শব্দদ্বয়ের ব্যবহার কয়েক বার দেখা যায়। অথচ তন্ত্রশাস্ত্রে মহামায়া যোগমায়া, যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া—শব্দচতুষ্টয় একার্থবোধক। গীতাতে যোগমায়া শব্দটী মাত্র এক বার আছে। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন যে, অবতার পুরুষ যোগমায়া সমাবৃত হইয়াই লীলাদি কার্য্য করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যোগমায়া ও বিষ্ণুমায়া শব্দের বহুবার উল্লেখ আছে। মহামায়া কাত্যায়নাশ্রমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডীতে তিনি কাত্যায়নী নামেও অভিহিতা। এই কাত্যায়নীই ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্রজাঙ্গনাগণ মনোমত পতিলাভের জন্য তাঁহার আরাধনা করিতেন। ভাগবতে কাত্যায়নী দেবীকে চণ্ডিকা, ভদ্রকালী ও নারায়ণী প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতের

বৈষ্ণবতোষিণী টীকার মতে যোগনিদ্রাই যোগমায়া। কিন্তু ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে মহামায়া ও যোগমায়া পৃথক্।

বেদান্তের মায়া ও তন্ত্রের মহামায়া সমানার্থক নহে। বেদান্তের মায়ার পারমার্থিক সত্তা নাই। ইহার কেবল ব্যবহারিক সত্তা মাত্র আছে। কিন্তু তন্ত্রের মহামায়া ত্রিকালাবাধিতা সত্তারূপিণী ব্রহ্মময়ী। অবশ্য বেদান্তে ও তন্ত্রে কোন বিরোধ নাই। কারণ প্রথমটী সিদ্ধান্তশাস্ত্র ও দ্বিতীয়টী সাধন-শাস্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামপ্রসাদ একটী বাক্যেই মহামায়া-তত্ত্বটী অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই কালী এবং কালীই ব্রহ্ম। যাহাকে বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম বলেন, তান্ত্রিকগণ তাঁহাকেই জগজ্জননী মহামায়ারূপে আরাধনা করেন। ব্রহ্ম ও মহামায়া-শক্তি অভেদ। সোঽহম্ অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্ম —ইহাই বেদান্তের চরম অনুভূতি। শাক্ত মতেও সাঽহম্ অর্থাৎ আমি সেই সনাতনী ব্রহ্মশক্তি—ইহাই তন্ত্রসাধনার শেষ অনুভব। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী এই অনুভূতির অধিকারিণী হইয়া বলিয়াছিলেন, 'অহং রাষ্ট্রী' অর্থাৎ আমি জগদীশ্বরী, বিশ্বজননী, মহামায়া। ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তে ইহা বিবৃত। মহামায়াতত্ত্বের মূল কথাটী দেবীসূক্তেই পাওয়া যায়। সুতরাং এই তত্ত্ব বৈদিক, অবৈদিক নহে। কেনোপনিষদে আছে, উমা হৈমবতী আবির্ভূতা হইয়া ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে শিক্ষা দেন যে, দেবগণ তাঁহার শক্তিতে শক্তিমা। ঋগ্বেদে অগ্নিবর্ণা দুর্গার ধ্যান আছে।

তিন

চণ্ডীর প্রথম চরিত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর তিনটী চরিত্র বর্ণিত আছে—প্রথম চরিত্র মহাকালী, দ্বিতীয় চরিত্র মহালক্ষ্মী ও তৃতীয় চরিত্র মহাসরস্বতী। শক্তি-সাধক মেধামুনি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির নিকট চণ্ডীদেবীর চরিত্র-ত্রয় ব্যক্ত করেন। সুরথ ছিলেন ধর্মপ্রাণ রাজা। তিনি শাস্ত্রোক্ত রাজধর্মানুসারে প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। একদা যবনরাজগণের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। মহাভাগ সুরথ স্বীয় রাজধানীতে অবস্থান-কালে দুষ্ট, দুরাত্মা ও বলী অমাত্যগণ শত্রু-গণের চক্রান্তে তাঁহার ধনাগার ও সৈন্যাদি অধিকার করিল। অনন্তর সুরথ রাজ্যচ্যুত হইয়া মৃগশিকারচ্ছলে একাকী অশ্বারোহণে গহন বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি দ্বিজবর মেধামুনির প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণ মুনিশিষ্যোপশোভিত আশ্রম দেখিতে পাইলেন। মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুরথ তাঁহার আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক কিছু সময় কাটাইলেন। মমত্বাকৃষ্ট চিত্তে তিনি পরিত্যক্ত রাজধানী, ধনভাণ্ডার, ভৃত্য, হস্তী ও অশ্বাদির বিষয় ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে আশ্রম-সমীপে সশোক দুর্মনা বৈশ্য সমাধি উপস্থিত হইলেন। সুরথের প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণে সমাধি বিনয়াবনত হইয়া বলিলেন, অসাধু স্ত্রীপুত্রগণ আমার ধনাদি আত্মসাৎ করায় আমি মনের দুঃখে বনে আসিয়াছি। বনবাসী হইয়াও সমাধি স্ত্রী, পুত্র ও ধনসম্পদের কথা ভাবিতেছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত স্ত্রীপুত্রগণের প্রতি তিনি এত স্নেহাসক্ত ছিলেন যে, তাহাদের

জন্য বৈশ্যের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছিল এবং দুশ্চিন্তা হইতেছিল। সুরথ ও সমাধি স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মমতা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না।

ইহার প্রকৃত কারণ অবগত হইবার জন্য উভয়ে মেধামুনির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণামান্তে উপবেশন করিলেন। সুরথ মেধামুনিকে প্রশ্ন করিলেন, "বিষয়াদিতে দোষদর্শন সত্ত্বেও ইহাদের প্রতি মমতা থাকে কেন?" মুনি বলিলেন, "আহার-নিদ্রাদির জ্ঞান পশুর ও মানুষের সমান। তবে পশুর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষের ধর্মজ্ঞান আছে; আর পশুর ধর্মজ্ঞান নাই। সুতরাং ধর্মহীন মানুষ পশুতুল্য। দেখুন, শাবকের ভোজনে নিজেদের ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না জানিয়াও পক্ষিগণ ক্ষুধায় পীড্যমান হইয়া মোহবশতঃ শাবকগণের চঞ্চুপুটে শস্যকণা প্রদানে কত অনুরক্ত! আহা! মানবগণ প্রত্যুপকারের লোভে পুত্রাদির প্রতি অনুরক্ত হয়। বিবেকের আলোকে অনুধাবন করিলে এই অপ্রিয় সত্য আপনার মনেও প্রতিভাত হইবে। সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মমতাবর্তে ও মোহগর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। এই মহামায়াই জগদম্বার মোহিকা শক্তি। এই শক্তিই জগৎকে মোহগ্রস্ত করিয়াছেন।"

মেধামুনি মমতাকে আবর্ত বলিয়াছেন। ঘূর্ণায়মান জলে বা বায়ুতে পতিত হইলে জলযান বা বায়ুপোত যেমন জলমগ্ন বা ভূপতিত হয় মানুষ তেমনি মমতাবদ্ধ হইলে পরমার্থভ্রষ্ট হয়। 'এইটী আমার'—ইহাই মমত্ববুদ্ধি। এই বুদ্ধি অহংভাব-বর্দ্ধক। মুনিবরের মতে মোহ এক প্রকার গর্ত। গর্তে পতিত মানুষ যেমন নিজে উঠিতে পারে না, মোহগ্রস্ত ব্যক্তিও স্বয়ং নিজের মোহ নাশ করিতে অক্ষম। মমত্ব মোহোৎপাদক। গীতাতে আছে, 'মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বিবেকবুদ্ধির নাশ,

বিবেকনাশ হইতে সর্বনাশ হয়। সর্বনাশ অর্থে পরমার্থের অযোগ্যতা। মহামায়াই মর্ত্যকে মোহাচ্ছন্ন করেন স্বষ্টি-ক্রীড়া পরিচালনের জন্য। মেধামুনি সুরথ ও সমাধিকে পুনরায় বলিলেন, "বিবেকহীনগণের কি কথা? দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকিগণেরও চিত্তসমূহ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন। ভবাদৃশ সংসারিগণের কি কথা? মহামায়া অপক্ককষায় যোগিগণেরও মোহিকা। তিনিই এই সমস্ত চরাচর জগৎ স্বষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন। তিনি প্রসন্না হইলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্টবরদাত্রী হন। তিনি সংসারমুক্তির হেতুভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সনাতনী। তিনিই সংসার-বন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী।"

মহামায়াতত্ত্বই শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়। 'মহামায়া' শব্দটী চণ্ডীতে আটবার উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর টীকাকার নাগোজী ভট্ট এবং গোপাল চক্রবর্তীর মতে মহামায়া যথাক্রমে বিসদৃশ প্রতীতি-সাধিকা ঈশ্বরী শক্তি ও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি। এই মহাশক্তির দ্বারা ঈশ্বর স্বষ্টিসংহারাদি ও জন্মলীলাদি কার্য্য করেন। জীবের বন্ধন ও মুক্তি তাঁহারই অধীন। উপাসকগণের মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য ইনি অভৌতিক রূপ ধারণপূর্ব্বক দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নামে অভিহিতা হন। দেবীভাগবতে (৫।৮) ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে মহামায়ার স্বরূপ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—'নটের রূপ এক হইলেও যেমন সে লোকরঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গমঞ্চে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী নিরাকারা হইয়াও দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ স্বলীলায় সত্ত্বাদিগুণযুক্ত বিবিধ রূপ ধারণ করেন।' এই গ্রন্থে (৩।৭) ব্রহ্মা নারদের নিকট মহামায়া-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে মহামায়াকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবতী বলা হইয়াছে। রুদ্রযামলের মতে মহামায়াই পরব্রহ্ম।

চণ্ডীর টীকাকার ভাস্কর রায় বলেন, 'চণ্ডী পরব্রহ্মের পট্টমহিষী দেবতা।' বাংলার শক্তিসাধক শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীকমলাকান্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মতে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্ম সক্রিয়, সগুণ ও সাকার হইলেই মহামায়া নামে কথিতা হন। নিশ্চল ও সচল সর্প যেমন এক, প্রশান্ত ও তরঙ্গায়িত জলাশয় যেমন অভিন্ন, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মও তেমনি অভেদ। দুগ্ধ ও ইহার ধবলতা, সূর্য্য ও ইহার আলোক, অগ্নি ও ইহার দাহিকা-শক্তি যেমন অভিন্ন, শিব ও শক্তি তেমনি অভেদ। দেবীপুরাণের নামনির্বাচনাধ্যায়ে মহামায়ার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কালিকাপুরাণে আছে—মাতৃগর্ভে অবস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন শিশু প্রসূতিবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যিনি তাহাকে নিরন্তর জ্ঞানরহিত করেন, যিনি পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারসমূহ দ্বারা জীবনে প্রথম দিনেই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞাননাশক মোহ ও মমতা দ্বারা আবৃত করেন, যিনি জীবকে ক্রোধ, উপরোধ ও লোভে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপপূর্বক পশ্চাৎ কামাসক্ত করিয়া অহর্নিশ চিন্তাযুক্ত, আমোদনিরত ও বাসনাসক্ত করেন সেই জগদীশ্বরীই এই জন্য মহামায়া বলিয়া কথিত হন।"

মেধামুনিকে রাজা সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন! যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্না হন এবং তাঁহার কার্য্যই বা কি? হে ব্রহ্মবিদ্বর, সেই মহামায়ার স্বভাব, স্বরূপ এবং আবির্ভাব সম্বন্ধে আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি।' মেধা ঋষি বলিলেন, 'সেই মহামায়া নিত্যা, জগন্মূর্ত্তি এবং বিশ্বব্যাপিনী। জগদতিরিক্ত মুখ্য শরীর তাঁহার নাই, তিনি জগদাশ্রয়ভূতা শক্তি। তথাপি তাঁহার সাকার আবির্ভাবের কথা আমার নিকট শ্রবণ করুন। দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিনি যখন আবির্ভূতা হন তখন তিনি উৎপন্না এইরূপে পৃথিবীতে অভিহিতা

হন। প্রলয়কালে বিশ্বপ্রপঞ্চ কারণসলিলে নিমজ্জিত হইলে ভগবান বিষ্ণু অনন্তনাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করিয়া যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তখন মধু ও কৈটভ নামক উগ্র অসুরদ্বয় বিষ্ণুর কর্ণ-মল হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা ভীত হইয়া প্রসুপ্ত বিষ্ণুর বিবোধনের নিমিত্ত তেজঃস্বরূপ বিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা অতুলা বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতিসংহারকারিণী ভগবতী তামসী দেবীর একাগ্র চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা মহামায়ার যে স্তব করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ এইরূপ—"হে নিত্যা অক্ষরা দেবী, আপনিই দেবোদ্দেশে হবির্দানের স্বাহামন্ত্ররূপা। আপনিই যজ্ঞে দেবাহ্বানের স্বধামন্ত্ররূপা। আপনিই পিতৃলোকের উদ্দেশে দ্রব্যদানের স্বধামন্ত্ররূপা। আপনি যজ্ঞমন্ত্ররূপা, স্বরাত্মিকা, মাত্রাত্রয়রূপা, প্রণবরূপা, অমৃতস্বরূপিণী। আপনি অনুচ্চার্য্যা নির্গুণা, সাবিত্রী, দেবজননী। আপনি এই জগৎকে সৃষ্টি, ধারণ, পালন ও সংহার করেন। হে জগন্ময়ী, আপনি বিদ্যা ও অবিদ্যা, স্মৃতি ও অস্মৃতি, মহাদেবী ও মহাঅসুরী, সর্বভূতের প্রকৃতি ও ত্রিগুণের তারতম্যবিধায়িনী। আপনি ব্রহ্মার কালরাত্রি, বিশ্বের মহারাত্রি এবং মানবের দারুণা মোহরাত্রি। আপনি শ্রী, ঈশ্বরী, হ্রী, বোধলক্ষণা বুদ্ধি, লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি ও ক্ষান্তিরূপে বিরাজিতা। আপনি খড়্গিনী, শূলিনী, ভয়ঙ্করী, গদিনী, চক্রিণী, শঙ্খিনী, চাপিনী, বাণ-ভূশুণ্ডী-পরিঘা-অস্ত্রধারিণী। হে দশভুজা মহাকালী, আপনি দশপ্রহরণ-ধারিণী, দশদিকে পরিব্যাপ্তা। আপনি ভক্তগণের প্রতি অতিসৌম্যা এবং অভক্ত দৈত্যগণের প্রতি ততোধিক রুদ্রা এবং সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষাও সুন্দরী। আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও শ্রেষ্ঠা, সর্বপ্রধানা দেবী ও পরমেশ্বরী। হে অখিলাত্মিকে, যে কোনও স্থানে যাহা কিছু চেতন বা জড়বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে

সেই সকলের শক্তি আপনিই। সুতরাং কিরূপে আপনার স্তব করিব? আপনি ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কিছুই নাই। আপনার স্তব কিরূপে সম্ভব? যিনি ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন এবং শিবরূপে সংহার করেন সেই পরমেশ্বরকেই আপনি যোগ-নিদ্রাবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং এই সংসারে কে আপনার স্ত করিতে সমর্থ? আপনি আমাকে, বিষ্ণুকে ও রুদ্রকে শরীর গ্রহণ করাইয়াছেন। কে আপনার স্তুতি করিতে পারে? হে মহাকালী, আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া স্বীয় অলৌকিক প্রভাবে দুরা-ধর্ষ অসুরদ্বয় মধুকৈটভকে মোহিত করুন। শীঘ্র আপনি জগৎস্বামী বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া এই মহাসুরদ্বয়কে বধ করিবার জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি সঞ্চার করুন।"

তামসী দেবী ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে সংস্তুতা হইয়া মধু ও কৈটভের বিনাশার্থ এবং বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গের জন্য বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও উরু দেশ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টি-গোচর হইলেন। যোগনিদ্রামুক্ত জগন্নাথ জনার্দন একীভূত জলময় বিশ্বে অবস্থিত অহিশয়ন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দুরাত্মা, মহাবীর্য্য ও মহাপরাক্রমশালী, ক্রোধরক্তেক্ষণ মধুকৈটভকে ব্রহ্মার বধের জন্য উদ্যত দেখিলেন। ভগবান হরি বাহুপ্রহরণ দ্বারা দীর্ঘকাল তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। অতিবলোন্মত্ত অসুরদ্বয় মহাকালীর প্রভাবে বিমোহিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, 'আমাদের নিকট বর প্রার্থনা করুন।' ভগবান বিষ্ণু বলিলেন, 'যদি তোমরা আমার যুদ্ধে তুষ্ট হইয়া থাক তবে তোমরা এই ক্ষণে আমার বধ্য হও। ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায়। এখানে অন্য বরের প্রয়োজন কি?' মহামায়া কর্তৃক বঞ্চিত ও বিমোহিত মধুকৈটভ সমগ্র বিশ্ব জলমগ্ন দেখিয়া কমললোচন বিষ্ণুকে বলিল, 'আপনার যুদ্ধে আমরা উভয়ে প্রীত

হইয়াছি। আপনার হস্তে আমাদের মৃত্যু শ্লাঘ্য। পৃথিবী যে স্থানে আপোময়, 'সলিলেন পরিপ্লুতা', নহে সেখানে আমাদের উভয়কে বিনাশ করুন।' তখন শঙ্খ-চক্র-গদাভৃৎ বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলিয়া অসুরদ্বয়ের মস্তক স্বীয় জঙ্ঘাদেশে স্থাপনপূর্বক চক্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিলেন।

বিষ্ণুদেহ হইতে দেবীর আবির্ভাবের দ্বারা মহাকালীর দেহের শুদ্ধমায়িকত্ব ও অপাঞ্চভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইল। মহাকালী দশভুজা, দশাননা ও দশপদা। তিনি দশ হস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনু, লগুড়, শঙ্খ, ত্রিশূল, ভূশুণ্ডী ও নরমুণ্ড ধারণ করেন। তিনি ত্রিনয়না, সর্বালঙ্কারশোভিতা, নীলকান্তমণিতুল্য জ্যোতিঃরূপা। ডামরতন্ত্র মতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রের ঋষি—ব্রহ্মা, দেবতা—মহাকালী, ছন্দঃ—গায়ত্রী, শক্তি—নন্দা, বীজ—রক্তদন্তিকা, তত্ত্ব অগ্নি, স্বরূপ—ঋগ্বেদ। ধর্মলাভের জন্য উক্ত চরিত্রপাঠের প্রয়োগ হয়। লক্ষ্মী তন্ত্রে আছে, 'মহাকালী তমোগুণময়ী, দুরধিগম্যা, সনাতনী, বৈষ্ণবী, মায়াশক্তি। ব্রহ্মাকথিত স্তবে ইনি আশুতুষ্টা হন।' তমঃপ্রধানপ্রকৃতি বিশিষ্ট অসুর বিনাশের জন্য তামসী দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। মহাকালীই যোগনিদ্রা, মহামায়া। কালিকাপুরাণে (৬।৫৯) ব্রহ্মা মদনকে যোগনিদ্রার এইরূপ বর্ণনা দিতেছেন—'যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, মধ্য ও অধোদেশে অধিষ্ঠিতা হইয়া পুরুষকে তাহা হইতে পৃথক করিবার পর স্বয়ং অন্তর্হিতা হন তাঁহারই নাম যোগনিদ্রা।" দেবীভাগবতে (১২।১৯-২০) আছে, 'যিনি সদা নির্গুণা, নিত্যা, ব্যাপিকা, অপরিণামিনী, মঙ্গলরূপিণী, ধ্যানগম্যা, বিশ্বাধারা ও তুরীয়া, তাঁহারই তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী শক্তি যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীরূপে আবির্ভূতা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিতে উক্ত মধুকৈটভ বধোপাখ্যানটী দেবী ভাগবতের ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত আকারে

পাওয়া যায়। শৌনকপ্রমুখ ঋষিগণ সূতসমীপে মধুকৈটভ যুদ্ধবিষয়ক প্রশ্নপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

মূর্খেণ সহ সংযোগো বিষাদপি সুদুর্জরঃ।
বিজ্ঞেন সহ সংযোগো সুধারসসমঃ স্মৃতঃ॥ ৬।৫

অর্থাৎ ইহ সংসারে বিষ প্রায়ই অজরণীয় বটে; কিন্তু মুর্খের সংসর্গ তাহা অপেক্ষাও দুর্জর। তেমনি প্রাজ্ঞের সহিত সংযোগকে পণ্ডিতগণ অমৃতরসতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঋষিগণের প্রশ্নোত্তরে সূত তাঁহাদিগকে দানবদ্বয়ের উৎপত্তি এবং স্বোৎপত্তির কারণানুসন্ধান বিষয়ে এইভাবে বলিয়াছিলেন।—মহাকায় মহাবীর ক্রূর-প্রকৃতি দানবদ্বয় একার্ণবসলিলে শেষশয্যাশায়ী বিষ্ণুর কর্ণমুল হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়-প্লাবিত সাগর মধ্যে পরিবর্ধিত হইল। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ কারণসলিলে ভ্রমণ করিতে করিতে উভয়ে মনে মনে ভাবিল, 'এই অসীম জলরাশি কে সৃষ্টি করিল? আমরাই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইলাম?' তাহারা এই প্রকার বিচার করিয়া বুঝিল, অনির্বচনীয়া শক্তিই এই সকলের মূলীভূত কারণ। যখন বিচারশীল অসুরদ্বয় এই দুষ্প্রাপ্য বোধ লাভে সমর্থ হইল, তখন একটি মনোহর বাগ্‌বীজমন্ত্র আকাশে সুশ্রুত হইল। শ্রুত মন্ত্রটি উপদেশরূপে গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহারা উহা জপ করিতে লাগিল। দৃঢ়াভ্যাসের ফলে জপ্ত মন্ত্রটী সৌদামিনীরূপে আকাশে সমুদিত হইল। সেই সময় তাহারা গগনে মাল্য-পুস্তক-পাশাঙ্কুশধারিণী সরস্বতীর সগুণ ধ্যানমূর্ত্তি দর্শন করিল। তাহারা নিরাহার, জিতাত্মা, তন্মনস্ক ও সমাহিত হইয়া দেবীর মন্ত্রজপে ও মূর্ত্তিধ্যানে ব্রতী হইল। এইরূপে দীর্ঘকাল কঠোর অনুষ্ঠানে কাটাইবার পর পরমা চিৎশক্তিরূপিণী তাহাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া আকাশাভ্যন্তরে অদৃশ্যা থাকিয়া তাহাদিগের অনুগ্রহার্থ অশরীরী বাণী উচ্চারণ করিলেন, 'রে দৈত্যদ্বয়, তোমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর।' তপক্লিষ্ট দানবদ্বয়

আকাশবাণী শ্রবণান্তে স্বেচ্ছামৃত্যুর বর প্রার্থনা করিল। দেবী কহিলেন, 'মৎপ্রসাদে তোমাদের ইচ্ছামত মরণ হইবে ? তোমরা উভয়ে সুরাসুরের অজেয় হইবে'। দেবীর নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া দুর্দান্ত মধুকৈটভ মদগর্ব্বিত ভাবে প্রলয়সাগর মধ্যে জলজন্তুগণের সহিত স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইভাবে ভ্রমণকালে যোগানিদ্রাভিভূত বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে উক্ত শুভাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান করিতে বলিল। ব্রহ্মা ভীত হইয়া বিষ্ণুকে জাগ্রত করিবার জন্য তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে যখন বিষ্ণু জাগ্রত হইলেন না, তখন তিনি বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিরাজিতা ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন।

দেবীভাগবতে ব্রহ্মার যে স্তব আছে তাহা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রাপ্ত ব্রহ্মার স্তব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ; অথচ ইহা অতি সুন্দর ও সারগর্ভ। স্তবটীর সরল অনুবাদ এই—"হে মাতঃ, এই অখিল জগতে আপনিই যে একমাত্র কারণ তাহা আমি বেদবাক্যাবলী হইতে জানিয়াছি। তাহাতে আবার সমগ্র লোকমধ্যে সমধিক বিবেকবান্ পুরুষোত্তম বিষ্ণুকেও যখন আপনি এই প্রলয়কালে নিদ্রায় বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন তখন আর সে বিষয়ে সংশয় কি ? জননি, আপনি স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও অখিল জীবের মনোময় মন্দিরে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিতা থাকিয়া যে সমস্ত লোকমোহকর বিলাসরূপ লীলা করিয়া থাকেন, আমি, বিষ্ণু ও শিব সর্ব্বদেবের বরিষ্ঠ হইলেও সে সকল বুঝিতে পারি না। অধিক কি, আমি ত একেবারেই বিমোহিত হইতেছি। আবার লোকনাথ হরিও বিবশেন্দ্রিয় হইয়া যোগনিদ্রায় অভিভূত। তখন আমাদের অধীন এই বিশ্বসংসারে কোটি কোটি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ মধ্যে এইরূপ জ্ঞানিপ্রবর কে আছেন যে, আপনার ঈদৃশ অনির্ব্বচনীয় মায়া-বিলাস সলীলায় বিমূঢ় না হইয়া তাহার তত্ত্ব জানিতে পারেন ? সাংখ্য-

বাদী পণ্ডিতগণ বলেন, পুরুষ বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কোন কার্য্যই তিনি করেন না। যিনি ত্রিগুণপ্রধানা জড়স্বভাবা প্রকৃতি তিনিই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্রী। অম্বিকে, সত্যসত্যই কি আপনি জড়রূপিণী ? তাহা হইলে আপনি এই প্রলয়-সময়ে কি প্রকার জগন্নিবাস ভগবান্ বাসুদেবকে অচেতন করিয়া রাখিলেন ? ভগবতী ! আপনি স্বরূপতঃ নির্গুণা বিশুদ্ধচৈতন্যস্বভাবা হইলেও মুনিগণ আপনাকে প্রতিদিন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে সন্ধ্যা এইরূপ নাম কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন। হে ভবানি, আপনি সগুণরূপা হইয়া সৃষ্ট্যাদিকালে যে বিবিধ নাট্যলীলার বিস্তার করেন সেই সমস্তের কার্যকারণযোগ সম্বন্ধ কেহই সম্যকরূপে বিদিত নহেন। দেবি, এই জগতীতলে আপনিই জ্ঞানদায়িনী বুদ্ধিস্বরূপা। আপনি সুরগণের সুখদাত্রী। মাতঃ, অধিক কি বলিব, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডারের জীবনিবহে আপনিই একমাত্র কীর্তি, মতি, ধৃতি, কান্তি, শ্রদ্ধা এবং রতি। ফলতঃ এই ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে সে সমস্তই আপনি। মাতঃ, এই অনন্ত বিশ্বের আপনিই যে যথার্থ জননী তাহা আমি বিষমসঙ্কটাপন্ন হইয়া যোগনিদ্রাবিচেতন ভগবান বিষ্ণুকে প্রবোধিত করিতে যাইয়াই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। অতএব, আর ইহার অধিক বিবিধ তর্কজালনিষ্পন্ন অনুমানাদি প্রমাণ কি জন্য গ্রহণ করিব ? কেন না, লোকে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে অপর প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে ইহা একপ্রকার চিরসিদ্ধান্ত আছে। পরন্তু হে দেবি ! যখন শ্রুতিসকলও আপনাকে সর্বতোভাবে জানিতে সমর্থ নহে তখন বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কি প্রকারে আপনাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হইবেন ? কারণ, কার্য্যজাত এই অখিল জগৎ বা বেদসমূহ সমস্তই আপনা হইতে উৎপন্ন, তাহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ রহিয়াছে। হে অম্বিকে, আপনার অখিল কার্য্যকলাপ আমার মানসজাত পুত্র নারদাদি বা

অপরাপর মহর্ষিগণ কেহই জানিতে সমর্থ নহেন। অধিক কি? ভগবান হরি, ভব বা আমি যখন বুঝিতে পারি নাই তখন ভূতলমধ্যে এরূপ প্রজ্ঞাবান পুরুষ কে আছেন যে, আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে? বস্তুতঃ এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আপনার মহিমা অনির্ব্বচনীয়। দেবী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞক্রিয়াস্থলে 'স্বাহা' এই বেদমন্ত্রটী উচ্চারণ না করিতেন তাহা হইলে সহস্র সহস্র আহুতি প্রদত্ত হইলেও দেবগণ কোথাও কোন কালেই স্ব স্ব প্রাপ্য ক্রতুভাগ পাইতে সমর্থ হইতেন না। অতএব আপনি স্বাহাশক্তিরূপে যজ্ঞীয় হব্য দ্বারা আমাদিগেরও জীবনযাত্রা নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। ভগবতি, পূর্বকল্পে আমাদিগকে দুর্দান্তদৈত্যসম্ভূত ভয় হইতে আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন। বরদে, এবারেও সেইরূপ এই ঘোরমূর্ত্তি মধুকৈটভকে দেখিয়া ভয়ে কাতর হইয়াই আপনার শরণাগত হইতেছি। দেবি, যদিও ভগবান বিষ্ণু এই লোকের পালয়িতা তবুও আপনি যোগ-নিদ্রারূপে ইঁহার সমস্ত দেহাবয়বগুলিকে এতদূর বিবশ করিয়াছেন যে, তিনি যেন একেবারে জড়পিণ্ড হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। সুতরাং ইনি আমার এতাদৃশ দুঃখের বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। অতএব হে অম্বিকে! হয় এই আদিদেব বিষ্ণুকে এই অবস্থা হইতে মুক্ত করুন, না হয় এই প্রচণ্ড দানবদ্বয়কে স্বয়ং সংহার করুন। মাতঃ, এ জগতে যখন আপনিই একমাত্র অনন্ত প্রভাবসম্পন্না, তখন এ বিষয়ে আর আমি আপনাকে কি জানাইব? আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন। দেবি, যে সমস্ত দুর্মতিগণ আপনার পরম প্রভাব বিদিত নহে, তাহারাই হরিহরাদির ধ্যান করিয়া থাকে। কিন্তু জননী, এক্ষণে যখন ভগবান বিষ্ণুও নিদ্রিত আছেন, তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি যে ইহ জগতে আপনিই একমাত্র পরমারাধ্যা। অধিক

কি, এই হরি আপনার প্রভাবে এতদূর নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন যে, এক্ষণে সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীও নিজপতিকে প্রবোধিত করিতে সমর্থা নহেন। ভগবতি, আমার বোধ হয়, আপনি রমা দেবীকে বলপূর্বক যোগনিদ্রার বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই জন্য তিনিও অবশেন্দ্রিয়ের ন্যায় অবস্থিতা। সুতরাং প্রবোধলাভ করিতে পারিতেছেন না। হে দেবী, এই ভূমণ্ডলে যাহারা অপর দেবতার ভজন পরিত্যাগপূর্বক আপনাকেই সর্বতোভাবে সর্বকামনাপূরণকারিণী ও সর্বজননীরূপা জানিয়া আপনার চরণে বিলীনান্তঃকরণ এবং একান্তভক্তিপরায়ণ হইয়া আপনাকে ভজন করিয়া থাকে তাহারাই ধন্য। ভগবতি, ইহ জগতে আপনিই পরমপূজনীয়া। কারণ, তাদৃশপ্রভাবসম্পন্ন এই হরিও আপনার যোগনিদ্রাশক্তির অনতিক্রমণীয় প্রভাবে বন্দীকৃতের ন্যায় রহিয়াছেন। হায়! সেই মতি, কান্তি বা কীর্ত্তি প্রভৃতি শুভ বৃত্তিগুলি বিষ্ণুকে পরিহারপূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিল? জননি! এই সমস্ত জগতের আপনিই সর্বশক্তিরূপিণী। আপনিই অখিল প্রভাবের আধারভূতা। এই অনন্ত বিশ্বে উৎপদ্যমান বস্তুমাত্রই আপনা হইতে উৎপন্ন। দেবী, নাট্যাভিনেতা যেমন স্বরূপতঃ একরূপ থাকিয়াই রঙ্গভূমে আসিয়া আবশ্যকমত নিজের নানারূপ দেখাইতে থাকে, সেইরূপ আপনিও এই মোহজালময় সংসারনাট্যভূমিতে স্বরূপতঃ নিত্যা অবিকৃতা থাকিয়াই নানারূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে অম্বিকে, আদি যুগে বিষ্ণুকে প্রকাশিত করিয়া জগৎপালনের নিমিত্ত তাঁহাকে বিমলা সাত্ত্বিকী শক্তি প্রদানপূর্ব্বক অখিল সংসার রক্ষা করিয়াছিলেন। আবার এক্ষণে তাঁহাকেই নিদ্রাভিভূত রাখিয়াছেন। মাতঃ, আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করিয়া থাকেন। তাহাতে অপরের কি সাধ্য আছে যে, ইহার অন্যথা করিতে পারে? ভগবতি, এই জগতে

আমাকে সৃষ্টি করিয়া যদি বিনাশ করিবার ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে মৌন ভাব ত্যাগ করিয়া দয়া প্রকাশ করুন। হে ভবানি, আপনি কী নিমিত্তই বা এই কালস্বরূপ অসুরদ্বয়কে উৎপাদন করিয়াছেন তাহা জানি না। অথবা বোধহয়, মাতঃ, আপনি আমাকে উপহাসাস্পদ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছেন। জননি, আমি আপনার অদ্ভুত কার্য্যকলাপ অবগত হইয়াছি। কারণ, আপনি এই অখিল জগতের উৎপাদন করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্ররূপে বিচরণ করিয়া থাকেন। আবার কালে অবলীলাক্রমে এই সমস্ত সংসার আপনাতে বিলীন করেন। অতএব হে ভবানি, এইরূপ স্থলে যদি আমাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? হে অম্বিকে, যদি আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাগ হইলে ইহাদের হস্তে এই দণ্ডেই আমার বধকার্য সম্পন্ন করুন। মরণ নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। তবে এইমাত্র আক্ষেপ যে, আপনি প্রথমেই আমাকে এই সৃষ্টির কর্ত্তারূপে উৎপাদিত করিয়া যদি দৈত্যহস্তে নিপাতিত করেন, তাহা হইলে এই গুরুতর অপযশ আপনারই জানিবেন। দেবি, আপনার সমস্ত লীলা বালক্রীড়াবৎ তাহা আমি জানি। এক্ষণে উত্থান করুন। করালকালীরূপ ধারণপূর্বক হয় আমাকে, না হয় এই দৈত্যদ্বয়কে সংহার করুন। ফলতঃ, আপনার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করুন! যদি আপনি স্বয়ং সংহার না করেন তাহা হইলে যিনি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ, সেই হরিকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করুন। মাতঃ, আমি জানি, এই জগতের সমস্ত কার্য্যকলাপই আপনার আয়ত্ত।"

ব্রহ্মার স্তবে দেবী বিষ্ণুর সর্বাবয়ব হইতে আবির্ভূতা হইয়া আকাশে অবস্থিতা হইলেন। বিষ্ণু যোগনিদ্রামুক্ত হইয়া মধুকৈটভের সহিত যুদ্ধ করিলেন। অসুরদ্বয়কে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত ও বধ করিতে অক্ষম হইয়া দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি দেবীকে স্তব করিলেন।

বিষ্ণুর স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া মহাকালী তামসী দেবী রণাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া প্রথমে হাস্য করিলেন। পরে আরক্ত নয়নে সেই অসুরদ্বয়ের প্রতি মন্দস্মিতযুক্ত দ্বিতীয়কন্দর্পসদৃশ কটাক্ষ দ্বারা প্রহার করিলেন। পাপিষ্ঠ মধুকৈটভ মন্মথবাণে প্রপীড়িত হইয়া দেবীর প্রতি একাগ্রভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক জড়ের ন্যায় সেই স্থলে অবস্থিত রহিল। অসুরদ্বয় দেবী কর্তৃক একেবারে বিমোহিত হইল। বিষ্ণু তাহাদিগকে বর দিতে চাহিলে তাহারা বিষ্ণুকে বর প্রার্থনা করিতে বলিল। বিষ্ণু তখন উভয়কে তাঁহার হস্তে মৃত্যুবর লইতে বলিলেন। তিনি তাহাদিগকে স্বীয় উরুদেশে স্থাপনপূর্বক সুদর্শনচক্র দ্বারা নিধন করিলেন। অসুরদ্বয় গতাসু হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই প্রলয়প্লাবিত কারণসাগর তাহাদের মেদ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল। সেইজন্য পৃথিবীর নাম মেদিনী। মধুবধের জন্য বিষ্ণুর নাম মধুসূদন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রোক্ত সুরথসমাধি উপাখ্যানটিও দেবী ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের দ্বাত্রিংশৎ এবং ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত। উহাতে ঋষিমেধা এবং তাঁহার আশ্রমের একটী সুন্দর বর্ণনা আছে। সুরথ যখন মুনিবরকে দর্শন করিলেন তখন তিনি শালবৃক্ষতলে মৃগজিনাসনে সমাসীন শান্ত তপসাতিকৃশ ঋজু, শীত ও গ্রীষ্মে অনভিভূত, শিষ্যগণকে শাস্ত্রাধ্যাপনরত, বেদশাস্ত্রার্থদর্শী, ক্রোধলোভাদিরহিত, বিমৎসর, শমমণ্ডিত ও সত্যবাদী। তাঁহার আশ্রমটী বহুবৃক্ষসমাযুক্ত, নদীপুলিনসংস্থিত, নির্বৈর শ্বাপদাকীর্ণ, শিষ্যাধ্যয়নশব্দাঢ্য, মৃগযূথশতাবৃত, নীবারান্নসুপক্কাঢ্য, সুপক্কফলপাদপপূর্ণ, কোকিলারাব মুখরিত, হোমধূমসুগন্ধে আমোদিত, বেদধ্বনিসমাক্রান্তা এবং স্বর্গাদপি মনোহর।

প্রথম চরিত্রে মহামায়ার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মধুকৈটভবধে অক্ষম হইয়া দেবীর সাহায্য প্রার্থনাপূর্ব্বক স্তব করিলেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে দেব্যধীন।

দেবীর সৃষ্টিশক্তিই ব্রহ্মারূপে এবং পালনীশক্তি বিষ্ণুরূপে কার্য্যকরী। ত্রিগুণময়ী মহামায়ার তমঃ-শক্তিই শিবরূপে, রজঃশক্তি ব্রহ্মারূপে এবং সত্বশক্তিই বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত। তমঃশক্তি সংহার, রজঃশক্তি সৃষ্টি এবং সত্বশক্তি পালন করেন। মধুকৈটভ তমঃশক্তিসম্ভূত। প্রলয়কালে সংহারকর্ত্তা নিষ্ক্রিয় থাকনে; পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও যোগ-নিদ্রাভিভূত। সৃষ্টির প্রাক্কালে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিবার সংকল্প করিতেছিলেন। তখন মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, তমঃশক্তি রজঃ-শক্তিকে অভিভূত করিবার উপক্রম করিল। সেই জন্য তামসী দেবী আবির্ভূতা হইলেন এবং সত্বশক্তিরূপ বিষ্ণু তমোজাত অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। সত্ব তমঃকে অভিভূত করিয়া রজঃকে ক্রিয়াশীল করিল। নচেৎ সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইত না। সৃষ্টি আরব্ধ হইলে পালনকর্তার প্রয়োজন। সেইজন্য বিষ্ণু জাগ্রত হইলেন। সৃষ্টিশক্তি ও পালনী শক্তি সংহারশক্তিকে প্রলয় পর্যন্ত অভিভূত করিয়া নব কল্পের আরম্ভ করিল। প্রকৃতিতে গুণত্রয় যেরূপ ক্রিয়া করে মানব জীবনেও তদ্রূপ। তমঃকে বিনাশ না করিলে রজঃ বা সত্ত্ব প্রভাবশালী হইবে না। এই জন্য ধর্মজীবনের প্রারম্ভে মহাকালীর ধ্যান দ্বারা তমোবিনাশপূর্বক রজঃ ও সত্বকে ক্রিয়াশীল করিতে হয়। তাহা না হইলে তমোগুণজাত কামক্রোধাদি রিপু এবং কুসংস্কারাদি ধ্বংস করা অসম্ভব। মহাকালীর ধ্যান অভ্যাস দ্বারা মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর উপাসনার যোগ্যতা সাধক লাভ করেন।

চার

চণ্ডীর মধ্যম চরিত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে মধ্যম চরিত্র ব্যাখ্যাত। ডামরতন্ত্রের মতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত্রের ঋষি বিষ্ণু, দেবতা মহালক্ষ্মী, ছন্দঃ উষ্ণিক্, শক্তি শাকম্ভরী, বীজ দুর্গা, তত্ত্ব বায়ু, এবং স্বরূপ যজুর্বেদ। শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রীতির জন্য মধ্যম চরিত্র পাঠের বিনিয়োগ হয়। মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা। অষ্টাদশ হস্তে দেবী রুদ্রাক্ষের জপ-মালা, কুঠার, গদা, শর, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ, এবং সুদর্শন চক্র ধারণ করেন। লক্ষ্মীতন্ত্রে এবং বৈকৃতিকরহস্য তন্ত্রেও মহালক্ষ্মীর এইরূপ বর্ণনা আছে। মহালক্ষ্মী রজোগুণময়ী, কমলাসনা, প্রবালপ্রভা এবং মহিষাসুরমর্দিনী।

মহিষাসুরের জন্মবৃত্তান্ত চণ্ডীতে নাই; কিন্তু দেবীভাগবতে, বরাহ-পুরাণে ও কালীপুরাণে আছে। বরাহপুরাণমতে দৈত্য বিপ্রচিত্তির মাহিষ্মতী নাম্নী পুত্রী সিন্ধুদ্বীপ নামক তপস্যারত ঋষিকে মহিষীবেশে ভয় দেখাইয়াছিল। ইহাতে ঋষি তাহাকে 'মহিষীই হও' এই অভি-শাপ প্রদান করেন। সেই মাহিষ্মতীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়। চণ্ডীর ১১।৪৩-৪৪ মন্ত্রে বিপ্রচিত্তি শব্দের উল্লেখ আছে। কালী-পুরাণমতে মহিষাসুর রম্ভাসুরের তনয় এবং শিবাংশে জাত। রম্ভাসুরের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া মহাদেব তাঁহাকে পুত্রলাভের বর প্রদান করেন। মহিষাসুর কঠোর তপস্যা দ্বারা দেবীর নিকট চির সাযুজ্য

প্রার্থনা করিয়াছিল। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত্রটী বিস্তৃততর আকারে দেবীভাগবতের ৫ম স্কন্ধে দ্বিতীয় হইতে বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত উনিশটী অধ্যায়ে বর্ণিত। দেবীভাগবতের মতে মহিষাসুরের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ ঃ

রম্ভ ও করম্ভ নামক দনুর দুই পুত্র নিঃসন্তান ছিল। পুত্রকামনায় করম্ভ পঞ্চনদের পবিত্র জলে নিমগ্ন হইয়া তপস্যার অনুষ্ঠানে এবং রম্ভ রসাল বটবৃক্ষ অবলম্বনপূর্বক অগ্নির আরাধনায় নিরত হইল। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শচীপতি পঞ্চনদে গমন করিয়া কুম্ভীররূপ ধারণপূর্বক করম্ভ দানবের পদযুগল ধরিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। ভ্রাতার নিধনবার্তা শ্রবণে রম্ভ অতিশয় কুপিত হইয়া বামকরে স্বীয় কেশপাশ ধারণপূর্বক নিজ মস্তক ছেদন করিয়া পাবকে হোম করিতে অভিলাষ করিল। দক্ষিণ করে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া যেমন সে মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইল অমনি অগ্নিদেব তাহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করিলেন এবং অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পাবকের মধুর বাক্য শ্রবণে রম্ভাসুর দেবতা, দানব ও মানবের অজেয় পুত্র প্রার্থনা করিল। অগ্নিদেব তাহাকে বাঞ্ছিত পুত্রলাভের বরদান করিলেন। কোন শোভাময় রমণীয় স্থানে প্রস্থান কালে একটি সুদৃশ্য মত্ত মহিষী তাহার নয়নপথে পতিত হইল। রম্ভের সঙ্গমে মহিষী গর্ভবতী হইল। অপর এক মহিষ কামার্ত হইয়া উক্ত মহিষীকে আক্রমণ করিলে রম্ভ মহিষীকে রক্ষা করিতে যাইয়া শত্রুর তীক্ষ্ণ 'বিষাণ' আহত ও মৃত হয়। রম্ভের মৃতদেহ চিতায় আরোপিত হইলে সাধ্বী মহিষী পতির সহগমনার্থ শিখাসমাকুল প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিল। মহিষী মৃতা হইলে মহিষাসুর মাতৃগর্ভ পরিত্যাগ করিয়া চিতার মধ্যস্থল হইতে উত্থিত হইল। তখন রম্ভও পুত্রের প্রতি বাৎসল্যবশতঃ রূপান্তর ধারণ করিয়া রক্তবীজ নামে বিখ্যাত হইল। মহিষাসুর দানবরাজ হইয়া পৃথিবীর ও স্বর্গের আধিপত্য লাভের জন্য

সুমেরু পর্বতে গমনপূর্বক দেবতাদিগের বিস্ময়কর ও উৎকৃষ্ট কঠোরতর তপস্যা করিতে লাগিল। দশ সহস্র বৎসর ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিবার পর পিতামহ ব্রহ্মা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। চতুরানন হংসারোহনে তৎসন্নিধানে আগমন করিয়া তাহার অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। মহিষাসুর অমরত্ব কামনা করিল। পিতামহ তাহাকে অমরত্বের বর দিয়া বলিলেন, 'তবে কামিনীর হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে।' মহিষাসুর অমরত্ব লাভে দর্পিত হইয়া সমগ্র ভূমণ্ডল অধিকারান্তে স্বর্গসাম্রাজ্য আকাঙ্খা করিল। দেবগণের সহিত অসুরগণের মহাযুদ্ধ হইল। এই দেবাসুর যুদ্ধের বর্ণনা চণ্ডীতে নাই; কিন্তু দেবীভাগবতের কয়েকটী অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

চণ্ডীতে মাত্র এইটুকু আছে, 'অসুররাজ মহিষাসুর ও দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে পূর্ণ একশত বৎসর যুদ্ধ হইল।' সেই যুদ্ধে মহিষাসুর দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। পরাভূত দেবগণ পদ্মযোনি প্রজাপতিকে পুরোবর্তী করিয়া শিব ও বিষ্ণুর সমীপে গমন করিলেন। দেবগণ তাঁহাদের পরাভব-কাহিনী ও মহিষাসুরের দৌরাত্ম্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, 'সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণের অধিকারসমূহে অসুরগণ অধিষ্ঠিত হইয়াছে। দুরাত্মা মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া আমরা মনুষ্যগণের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। দেবশত্রু অসুরগণের দৌরাত্ম্যসমূহ আপনাদের নিকট বলিলাম এবং আমরা আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম। এখন আপনারা উভয়ে মহিষাসুরের বধোপায় বিচিন্তা করুন।' ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মধুসূদন ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভ্রূকুঞ্চনে তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করিল। অনন্তর অতিক্রোধান্বিত বিষ্ণুর এবং পরে ব্রহ্মা ও শিবের মুখমণ্ডল হইতে মহাতেজ নিঃসৃত

হইল। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতে সুমহৎ তেজ নির্গত হইয়া একত্র পুঞ্জীভূত হইল! পুরাণান্তরে প্রসিদ্ধ কাত্যায়নাশ্রমে দেবগণ সেই সুদীপ্ত তেজঃকূটকে জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তর জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় সমবস্থিত দেখিলেন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের তেজ যথাক্রমে সত্ত্বপ্রধান. রজঃপ্রধান ও তমঃপ্রধান। এইজন্য দেবী ত্রিগুণময়ী। কিন্তু, তাঁহাতে রজঃ ও সত্ত্বের আধিক্য বর্ত্তমান। কারণ, দেবতাগণের রজঃ ও সত্ত্বের প্রাচুর্য্য আছে। সর্ব্বদেবশরীরজ-ত্রিলোকব্যাপী অনুপম তেজরাশি একত্র হইয়া অপরূপ নারীমূর্তি ধারণ করিল। ইনিই দেবী মহালক্ষ্মী।

শাম্ভব তেজে মহালক্ষ্মীর মুখ, যাম্য তেজে তাঁহার কেশদাম এবং বৈষ্ণব তেজে তাঁহার অষ্টাদশ বাহু উৎপন্ন হইল। সৌম্য তেজে তাঁহার স্তনযুগ্ম, ঐন্দ্র তেজে শরীরের মধ্যভাগ, বারুণ তেজে জঙ্ঘা ও উরুদ্বয়, এবং পৃথিবীর তেজে তাঁহার নিতম্ব উদ্ভুত হইল। ব্রহ্মার তেজে তাঁহার পদযুগল, সৌর তেজে পাদাঙ্গুলিসমূহ, অষ্ট বসুর তেজে করাঙ্গুলীসকল এবং কুবেরের তেজে নাসিকা উৎপন্ন হইল। বৈকৃতিক রহস্যমতে যে দেবতার যে বর্ণ তাঁহার তেজও সেই বর্ণ বলিয়া বিবিধ তেজের বর্ণানুসারে দেবীর অঙ্গসকলও বিভিন্ন বর্ণ হইয়াছিল। বামন পুরাণের মতে দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তেজে তাঁহার দন্তসকল এবং বহ্নির তেজে দেবীর ত্রিনয়ন উৎপন্ন হইল। সন্ধ্যা দেবীদ্বয়ের তেজে তাঁহার ভ্রূযুগল ও বায়ুর তেজে কর্ণদ্বয় এবং বিশ্বকর্ম্মাদি অন্যান্য দেবগণের তেজঃসমষ্টি হইতে মহালক্ষ্মী চণ্ডিকার আবির্ভাব হইল। সমস্ত দেবতার তেজোরাশিসমুদ্ভবা মহালক্ষ্মীকে দেখিয়া মহিষার্দিতা অমরগণ আনন্দিত হইলেন। পিনাকধৃক্ স্বীয় শূল হইতে শূলান্তর এবং বিষ্ণু স্বীয় সুদর্শন চক্র হইতে চক্রান্তর উৎপাদন করিয়া মহালক্ষ্মীকে দিলেন। এইরূপে বরুণ শঙ্খ, হুতাশন শক্তি এবং মারুত একটি ধনু ও দুইটি বাণপূর্ণ তূণীর তাঁহাকে দান করিলেন। অমরাধিপ

সহস্রাক্ষ ইন্দ্র স্বীয় কুলিশ হইতে বজ্রান্তর এবং ঐরাবত নামক স্বর্গীয় গজের গলঘণ্টা হইতে ঘণ্টান্তর উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। দেবায়ুধসমূহ দেবশক্তিসম্পন্ন। এইরূপে মৃত্যুরাজ যম একটি কালদণ্ড এবং জলদেবতা বরুণ একটি পাশ, ব্রহ্মা একটি অক্ষমালা ও কমণ্ডলু তাঁহাকে দান করিলেন।

দেবীর সমস্ত রোমকূপে দিবাকর নিজ রশ্মিজাল এবং নিমেষাদি কালাভিমানিনী দেবতা একটি প্রদীপ্ত খড়্গ এবং একটি নির্ম্মল ঢাল তাঁহাকে দিলেন। ক্ষীরোদ তাঁহাকে উজ্জ্বল মুক্তাহার, অজর অম্বর-যুগল, দিব্য চূড়ামণি, ও দুইটি কুণ্ডল, এবং হস্তসমূহের বলয়গুলি, শুভ্র ললাটভূষণ, সকল বাহুতে অঙ্গদ, বিমল নূপুর, অনুত্তম গ্রীবালঙ্কার, এবং সমস্ত অঙ্গুলিতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরীয়ক দান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে তীক্ষ্ণধার কুঠার, অনেকরূপ অস্ত্র, এবং অভেদ্য কবচ দিলেন। জলধি তাঁহার মস্তকে ও বক্ষে অম্লান পঙ্কজমালা, এবং তাঁহার হস্তে পরমসুন্দর পদ্ম, হিমালয় সিংহবাহন ও বিবিধ রত্ন এবং কুবের সদাপূর্ণ সুরাপাত্র দিলেন। অন্যান্য দেবগণ কর্তৃকও অলঙ্কার ও অস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া মহালক্ষ্মী দেবী মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য ও হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপরিমিত মহাগর্জনে সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ হইল ও ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠিল। সেই সিংহনাদে ঊর্দ্ধে সপ্ত লোক এবং নিম্নে সপ্ত লোক সংক্ষুব্ধ, সপ্ত সমুদ্র কম্পিত, এবং পৃথিবী ও পর্ব্বতসমূহ বিচলিত হইল। সমবেত দেবতাগণ আনন্দে সিংহবাহিনীর জয়ধ্বনি করিলেন এবং ভক্তিভরে নম্রমূর্ত্তি হইয়া জগন্মাতার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবান্তে দেবগণ মহাদেবীকে প্রার্থনা করিলেন, 'হে দেবী, আমরা স্বর্গচ্যুত হইয়াছি। স্ত্রীবধ্য মহিষাসুরকে আপনি ব্যতীত আর কেহ বিনাশ করিতে পারিবেন না। আপনি তাহাকে সম্মোহিত করিয়া সংহার করুন।' দেবতাগণের

স্তবে প্রীতা হইয়া দেবী বলিলেন, দেবগণ, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। আমি আজই দেবশত্রু মহিষাসুরকে বিনাশ করিব।'

বিশ্বমোহিনী দেবীকে মহিষাসুর পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য সুমনোহর মানবরূপ ধারণ করিয়া দেবীর সমীপে উপস্থিত হইল; যে দেবীর অঙ্গজ্যোতিঃতে ত্রিভুবন আলোকিত, যাঁহার পদভরে পৃথিবী অবনত, যাঁহার ধনুকের জ্যা-শব্দে পাতাল পর্য্যন্ত আকুলিত, যিনি সহস্রভুজে সর্ব্বদিক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত ও যিনি গগন-স্পর্শী মুকুট পরিহিতা তাঁহাকে মহিষাসুর দর্শন করিয়া বিমোহিত হইল। মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা হইলেও সহস্রাভুজা। এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। সুতরাং মহালক্ষ্মী অনন্তভুজা, বিশ্বব্যাপিনী। চণ্ডীর ১১।১৯ মন্ত্রে দেবী সহস্রনয়নারূপে বর্ণিতা। মহিষাসুরের অভিলাষ শ্রবণে দেবী তাহাকে অট্টহাস্যে বলিলেন, 'আমি পরম পুরুষ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করি না। আমি পরম শিবের শক্তি এবং বিশ্বস্রষ্ট্রী। তুমি সুরগণের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্য তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ কর। নচেৎ আমি তোমাকে অচিরে সংহার করিব। তোমাকে বিনাশ করিবার জন্যই আমি আবির্ভূতা।' মহিষাসুর উক্ত প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর সুরদ্বেষী অসুরগণ বহু প্রকারে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের দীপ্তিতে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া মহালক্ষ্মীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মহিষাসুরের সেনানী চিক্ষুর ও চামর চতুরঙ্গ বলান্বিত হইয়া যুদ্ধে নামিল। উদগ্র, অসিলোমা, বাস্কলাসুর, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি মহাসুরগণ রথ, হস্তী ও অশ্বাদি সহযোগে দেবীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সুরর্ষিগণ কর্তৃক স্তূয়মানা অনায়স্তাননা দেবী অসুর-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়া তাহাদিগের প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিলেন। দেবীবাহন সিংহও ক্রোধে কম্পিত-কেশর হইয়া

বনে দাবাগ্নির ন্যায় অসুর সৈন্যের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। রণক্ষেত্রে মহালক্ষ্মী যুদ্ধ করিতে করিতে যে সকল নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন সেইগুলিই তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ দেবীসৈন্যরূপে পরিণত হইল। সেই যুদ্ধ-মহোৎসবে দেবীর সৈন্যগণ ঢাক, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল এবং দেবী ত্রিশূল, গদা ও খড়্গাঘাত এবং শক্তি-অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা শত শত মহাসুর বিনাশ করিলেন। দেবীর ঘণ্টা-ধ্বনিতে অনেক অসুর ভূপতিত হইল। কতকগুলিকে তিনি পাশ-বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিলেন। কেহ কেহ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত. কেহ গদাপ্রহারে বিমর্দ্দিত হইল। কেহ মুষালাঘাতে আহত হইয়া রক্ত বমন করিল; কাহারো বা শূলাঘাতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইল। অসুর সৈন্যদলের অগ্রগামীগণ সর্ব্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ ও জর্জ্জরিত হইয়া সজারুসদৃশ দেহে প্রাণত্যাগ করিল। কেহ ভগ্নগ্রীব, কেহ ছিন্নবাহু, কেহ ছিন্নমস্তক, কেহ একবাহু হইয়া মরিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরগণের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইল। হতাহত অসুরগণের রক্তধারা বৃহৎ নদীসমূহের ন্যায় প্রবাহিত হইল। অগ্নি যেমন তৃণস্তূপ ও কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করেন সেইরূপ মহালক্ষ্মী বিশাল অসুরসৈন্য ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস করিলেন। দেবী অনায়াসে সেনাপতি চিক্ষুর, চামর, উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য, মহাহনু প্রভৃতি অসুরগণকে বধ করিলেন। ক্রোধে প্রজ্বলিত মহিষাসুরকে সবেগে আসিতে দেখিয়া তাহার বধের জন্য চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইলেন। ভুবনেশ্বরী সংহিতাতে আছে, 'যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হয়, ইন্দ্র, অগ্নি ও মৃত্যু স্ব স্ব কার্য্য করেন, সেই দেবীই চণ্ডিকা।' মহিষাসুর কখনও সিংহরূপে. কখনও পুরুষরূপে, কখনও বা হস্তীরূপে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিল। পুরাণান্তরমতে মায়াবী মহিষাসুর যথা-ক্রমে মহিষ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার. শূকর, সিংহ, পুরুষ, গজ ও পুনরায় মহিষ

মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া পুনঃ পুনঃ দিব্য সুরা পান করিয়া আরক্তনয়না হইয়া অট্টহাস্য করিলেন। চণ্ডীর টীকাকার নাগোজীভট্টের মতে মহিষাসুরের শিবাবতারত্বহেতু জায়মান দয়াদি বিচ্ছেদের জন্য দেবীর মদ্যপান। অবশেষে দেবী মহিষাসুরকে পদ দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া শূলবিদ্ধ করিলেন। মহিষাসুর দুর্গার পদতলে প্রাণত্যাগ করিল। এই মহিষাসুর-মর্দিনী সিংহবাহিনী দুর্গার পূজা প্রতিমাতে প্রত্যেক বৎসর বাংলাদেশে হইয়া থাকে। মহিষাসুরবধে আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ, ও নারদাদি ঋষিগণ দেবীর স্তব করিলেন, বিশ্বাবসু আদি গন্ধর্বগণ গান করিলেন, এবং উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করিলেন।

শক্রাদি সুরগণ গ্রীবা ও স্কন্ধ আনত করিয়া মহালক্ষ্মী দেবীকে প্রণামপূর্ব্বক আনন্দপুলকিত চারু দেহে এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন—"ইন্দ্রাদি দেবগণের শক্তিরাশির ঘনীভূত মূর্ত্তি যে দেবী স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, সমস্ত দেব ও ঋষিগণের আরাধ্যা সেই মহালক্ষ্মীকে আমরা ভক্তি-পুর্ব্বক প্রণাম করি। তিনি আমাদের সকল মঙ্গল বিধান করুন। ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব যাঁহার অনুপম প্রভাব ও অসীম শক্তি বর্ণনা করিতে অক্ষম সেই চণ্ডিকা সমগ্র বিশ্ব পরিপালনের নিমিত্ত এবং আমাদের অসুরভীতি নিবারণের জন্য ইচ্ছা করুন। যিনি স্বয়ং সুকৃতিগণের গৃহে লক্ষ্মী, আবার পাপাত্মাগণের গৃহে অলক্ষ্মী, যিনি শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধি, ও সজ্জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও সদ্বংশজগণের লজ্জা সেই দেবীকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবী, আপনি এই জগৎ পরিপালন করুন। হে দেবী, দৈত্য, দেবতা, প্রমথ ও ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে আপনার এই অচিন্ত্য রূপ, অসুরক্ষয়কারি বীর্য্য বা অসুরসংগ্রামে আপনার এই অত্যদ্ভুত আচরণ কিরূপে বর্ণনা

করিব ? দেবী, আপনি বাক্যমনাতীত ব্রহ্মস্বরূপিনীও সমগ্র জগতের মূল কারণ ! আপনি সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আশ্রয় করিলেও রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে জানিতে পারে না। আপনি শিব, বিষ্ণু দেবাদিগণেরও অজ্ঞাত। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত এই অখিল বিশ্ব আপনার অংশভূত। কারণ, আপনিই সকলের আশ্রয়স্বরূপ। আপনি ষড়বিকার-রহিতা, পরমা আদ্যা প্রকৃতি।" চণ্ডীর শান্তনবী টীকামতে এই দেবীকে সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতি এবং বেদান্তিগণ অনির্বচনীয় অনাদি অবিদ্যা বলেন। শাব্দিকগণ তাঁহাকে শব্দশক্তি, মীমাংসকগণ তাঁহাকে কর্মের অপূর্ব উপাদান-সামর্থ্য লক্ষণা ফলগতি, তার্কিকগণ তাঁহাকে বস্তুতত্ত্বাবসিতিসিদ্ধি ভেদা, শৈবগণ তাঁহাকে শিবশক্তি, বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুমায়া, শাক্তগণ মহামায়া এবং পৌরাণিকগণ দেবী বলেন।

দেবতাগণ মহালক্ষ্মীকে স্তব করিতে লাগিলেন—"হে দেবী, যাহার সম্যক্ উচ্চারণে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সমস্ত যজ্ঞে তৃপ্তিলাভ করেন সেই স্বাহা মন্ত্রও আপনি। পিতৃগণের তুষ্টির কারণ স্বধামন্ত্রও আপনি। এই জন্য পিতৃযজ্ঞ এবং দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীগণ আপনাকে স্বাহা ও স্বধামন্ত্র-রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। দেবী, যে পরাবিদ্যা মুক্তির কারণ, যোগশাস্ত্রোক্ত দুরনুষ্ঠেয় যমনিয়মাদি মহাব্রত যাহার সাধন সেই পরমা ব্রহ্মা বিদ্যা ভগবতী আপনিই। এই জন্য জিতেন্দ্রিয় তত্ত্বনিষ্ঠ শুদ্ধচিত্ত মুমুক্ষু মুনিগণ সেই ব্রহ্মবিদ্যা আকাঙ্খা করেন। হে দেবি, আপনি শব্দব্রহ্মরূপা। আপনি বিশুদ্ধ ঋক্ ও যজুঃমন্ত্রসমূহের এবং উদাত্তাদি স্বর ও মধুর পদোচ্চারণাবিশিষ্ট সামমন্ত্রসকলের আশ্রয়স্বরূপা। আপনি বেদত্রয়রূপা ও সর্বৈশ্বর্য্যময়ী। আপনি বিশ্বপালনের জন্য কৃষি, বাণিজ্যাদি বৃত্তিরূপা এবং সমগ্র জগতের দুঃখ-হারিণী। দেবী, লোকে যাহার দ্বারা সকল শাস্ত্রের মর্ম অবগত হয়, সেই মেধারূপিণী সরস্বতী আপনিই। আপনি দুস্তর সংসার সমুদ্রের

তরণী। আপনি অদ্বিতীয়া ব্রহ্মময়ী। আপনি নারায়ণের হৃদয়বিলাসিনী লক্ষ্মী, এবং আপনিই মহাদেবের হৃদয়বিহারিণী গৌরী। আপনি একাধারে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী। দেবি, আপনার ঈষদ্‌হাস্যময়, নির্মল, পূর্ণচন্দ্রতুল্য এবং উৎকৃষ্ট স্বর্ণপ্রভাময়ী জগন্মোহক মুখমণ্ডল দেখিয়াও মহিষাসুর ক্রোধভরে আপনাকে হঠাৎ নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিল। ইহা অতি অদ্ভুত। দেবী দর্শনে ভক্তের ষড়রিপুনাশ জড়িত চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সদ্য পরম তত্ত্বোপলব্ধি হয়। কিন্তু মহিষাসুরের তদ্বিপরীত হওয়ায় প্রমাণিত হয়, সে মহপাপী ও ভাগ্যহীন। আপনার ক্রোধাবিষ্ট, ভ্রুকুটী-ভীষণ নবোদিত পূর্ণচন্দ্রতুল্য আরক্তবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়াও যে মহিষাসুর তখনই প্রাণত্যাগ করে নাই, ইহা অতীব আশ্চর্য্য! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। আপনি পরম কৃপাময়ী। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আপনি ক্রোধান্বিত হইয়া সদ্য অসুরকুল নাশ করেন। মহিষাসুরের বিপুল সৈন্য আপনা কর্তৃক বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ইহা আমরা সম্প্রতি অবগত হইলাম। সদাভীষ্টদায়িনী আপনি যাহাদের প্রতি প্রসন্না হন তাহারা সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়, তাহাদের সম্পদ ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ হ্রাস হয় না। তাহাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাভৃত্যাদি নিরাপদে থাকে এবং তাহারাই ভাগ্যবান্। আপনার অনুগ্রহে পুণ্যশীল ব্যক্তি সদাই অতি শ্রদ্ধার সহিত ধর্মবিহিত কর্ম-সকল প্রতিদিন অনুষ্ঠান করেন এবং তাহার ফলে স্বর্গলাভ ও ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করেন। দেবি, আপনি ত্রিভুবনে একমাত্র ফলদায়িনী ও চতুর্বর্গদাত্রী। দুঃসময়ে আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি বিপদ নাশ করেন। সুসময়ে বিবেকীগণ আপনাকে চিন্তা করিলে আপনি তাহাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান করেন। হে দারিদ্র্যহারিণি, হে দুঃখবিনাশিনি, হে ভয়নাশিনি, সকলের কল্যাণ বিধানার্থ সর্বদা দয়াদ্রচিত্ত আপনি ভিন্ন আমাদের রক্ষাকর্ত্রী আর কে আছেন? দেবি, এই অসুরগণ

নিহত হইলে জগতে শান্তি বিরাজ করিবে। ইহারা দীর্ঘকাল নরক ভোগজনক পাপ করিলেও সম্মুখ সমরে মৃত্যুলাভ করিয়া দিব্যলোকে গমন করিবে। নিশ্চয়ই ইহা মনে করিয়া আপনি দেবশত্রু অসুরনাশে প্রবৃত্ত হন। আপনি দৃষ্টিমাত্রই সমস্ত অসুর ভস্মীভূত করিতে পারিতেন। তথাপি আপনি যে তাহাদের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করেন তাহার কারণ, শত্রুগণও আপনার অস্ত্রাঘাতে পাপমুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধ লোকে গমন করিবে। তাহাদের প্রতি আপনার অতীব উদার অনুগ্রহ। দেবী, আপনি শত্রু নাশপূর্ব্বক ত্রিভুবন রক্ষা করিলেন। সেই দেবশত্রুগণও আপনার হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গলাভ করিল। উদ্ধত অসুরগণ হইতে আমাদের ভয়ও আপনি দূর করিলেন। আপনাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। দেবী, আমাদিগকে ত্রিশূলের দ্বারা রক্ষা করুন। অম্বিকে, আমাদিগকে খড়্গের দ্বারাও রক্ষা করুন। জননি, আমাদিগকে ঘণ্টাশব্দ ও ধনুষ্টঙ্কারধ্বনি দ্বারাও রক্ষা করুন। হে চণ্ডিকে, আপনার ত্রিশূল সঞ্চালনের দ্বারা আমাদিগকে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রক্ষা করুন। দেবী, ত্রিভুবনে আপনার যে সকল সৃষ্টিস্থিতিকারিণী সৌম্য মূর্ত্তি এবং সংহার কারিণী রুদ্র মূর্ত্তি বিদ্যমান সেই সকল দ্বারা আমাদিগকে এবং সমস্ত জগৎবাসীকে রক্ষা করুন। অম্বিকে, আপনার করপল্লবে খড়্গ, শূল ও গদা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে সেই সকল দ্বারা আমাদিগকে সর্বত্র রক্ষা করুন।”

দেবগণ জগদ্ধাত্রীকে এইরূপে স্তব করিবার পর দেবোদ্যানজাত পারিজাতাদি দিব্যপুষ্প, এবং কুঙ্কুমাদি দিব্য সুগন্ধ, অঙ্গরাগ ও ও মনোজ্ঞ ধূপাদি দ্বারা তাঁহারা প্রেমভক্তির সহিত দেবীকে পূজা করিলেন। তখন দেবী, প্রসন্ন বদনে প্রণত দেবগণকে বলিলেন— ‘অমরগণ, আমার নিকট তোমাদের যাহা বাঞ্ছনীয় আছে তাহা

প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের স্তবসমূহের দ্বারা সুপূজিতা হইয়া তোমাদের প্রতি সুপ্রসন্না হইয়াছি। তোমাদিগকে অভীষ্ট বরদান করিব।' দেবগণ বলিলেন—'হে ভগবতী আপনি আমাদের শত্রু মহিষাসুরকে বধ করিয়াছেন। ইহাতেই সমস্ত করা হইয়াছে; আর কিছুই বাকী নাই। হে মহেশ্বরী, যদ্যপি আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে বর দিতে ইচ্ছা করেন তবে আপনার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি যে, যখন আমরা বিপন্ন হইয়া আপনাকে পুনঃ পুনং স্মরণ করিব তখন আপনি আবির্ভূতা হইয়া আমাদের ঘোর-বিপদসমূহ নাশ করিবেন। হে অমলাননা, যে মানব এই সকল স্তব দ্বারা আপনার স্তব করিবে আমাদের প্রতি প্রসন্না আপনি তাহার জ্ঞান, ঋদ্ধি, বিভবাদি ও ধন সম্পদ স্ত্রী পুত্রাদি বৃদ্ধি করিবেন।'

এইরূপে দেবগণ নিজেদের ও মানবগণের কল্যাণের জন্য দেবীকে স্তবাদি দ্বারা প্রসন্না করিলে ভদ্রকালী 'তাহাই হউক' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। চণ্ডীমুখে দেবী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহাকে দেবগণ বা মানবগণ বিপদে স্মরণ করিলে তিনি তাঁহা-দের বিপদ দূর করিয়া রক্ষা করিবেন। দেবীর প্রতিশ্রুতি লক্ষ্মীতন্ত্রেও এইভাবে আছে, 'সুরগণ দ্বারা সংস্তুতা হইয়া আমি মহিষাসুরকে ক্ষণ-মধ্যে বিনাশ করিয়াছিলাম। মহিষাসুরবধজনক সূক্ত দেবগণ ও মহর্ষিগণ কর্তৃক সৃষ্ট। হে সুরেশ্বর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আমার আবি-র্ভাব, যুদ্ধবিক্রম ও মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন এবং তৎদ্বারা মোক্ষ ও চিরস্থায়ী অভ্যুদয় লাভ করেন।' দেবীভাগবতে শক্রাদি-কৃত দেবীস্তুতি স্বতন্ত্র ও সারগর্ভ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ কি? দেবাসুর সংগ্রামের কথা উক্ত চরিত্রের প্রারম্ভেই উল্লিখিত। এই দেবাসুর সংগ্রাম শুধু বহির্জগতে নহে, অন্তর্জগতেও চলিতেছে। মানব

জীবনে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যুদ্ধ, অসদ্‌বৃত্তি ও সদ্‌বৃত্তির দ্বন্দ্ব, অধর্ম ও ধর্মের সংগ্রামের প্রতীক এই দেবাসুর যুদ্ধ। মানবহৃদয় স্বর্গতুল্য। কারণ, উহাতে ইষ্টদেবতা বিরাজিত। হৃদয়-স্বর্গ হইতে সদ্ভাবরূপ দেবাদি অধর্মরূপ মহিষাসুর কর্তৃক নির্ব্বাসিত হইলে দেবীর আরাধনা আবশ্যক। অসদ্ভাবরাশি ও কুসংস্কারসমূহ বিনাশের জন্য দেবী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সকল অশুভ বিনাশপূর্ব্বক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনে ধর্মভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই শান্তিলাভ হয়। দেবীর সতত স্মরণে চিত্তের মলিনতা ভস্মীভূত হয় এবং ভাবসংশুদ্ধি হয়। তমোভাব এবং পাপাদি সমূলে বিনাশের জন্য ধর্মজীবনের প্রারম্ভে দেবীর ধ্যান আবশ্যক। স্ব স্ব ইষ্টদেবতার শরণাগত হইয়া জীবন পথে চলিলে বিপদদুঃখকষ্ট অচিরে অন্তর্হিত হয় এবং সুখশান্তির অধিকারী হওয়া যায়।

পাঁচ

চণ্ডীর উত্তম চরিত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ৫ম হইতে ১৩শ অধ্যায় পর্য্যন্ত উত্তম বা উত্তর চরিত্র বর্ণিত। ডামর তন্ত্র মতে উত্তম চরিত্রের ঋষি রুদ্র দেবতা মহাসরস্বতী,—ছন্দ অনুষ্টুপ্, শক্তি ভীমা, বীজভ্রামরী, তত্ত্বসূর্য্য এবং স্বরূপসামবেদ। শ্রীমহাসরস্বতীর প্রীতির নিমিত্ত উত্তর চরিত্র পাঠের প্রয়োগ হয়। মহাসরস্বতী সত্ত্বগুণময়ী ও অষ্টভূজা। তিনি অষ্টভুজে ঘণ্টা, শূল, লাঙ্গল, শঙ্খ, মুসল, চক্র, ধনু ও বাণ ধারণ করেন। তিনি মেঘমধ্যস্থিত চন্দ্রতুল্য স্নিগ্ধপ্রভাযুক্তা, শুম্ভাদি দৈত্যনাশিনী পার্বতীশরীরোদ্ভূতা এবং ত্রিভুবনের আধারস্বরূপিনী।

শুম্ভনিশুম্ভাদি দৈত্যনাশের জন্য মহাসরস্বতীর আবির্ভাব। কিন্তু শুম্ভ ও নিশুম্ভের আবির্ভাবাদির কথা চণ্ডীতে নাই, দেবীভাগবতাদি পুরাণে আছে। বামনপুরাণমতে কশ্যপের ঔরসে, এবং তাঁহার ভার্য্যা দনুর গর্ভে শুম্ভ ও নিশুম্ভের জন্ম হয়। দেবীভাগবতে আছে, পূর্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই ভ্রাতা পাতাল হইতে ভূমণ্ডলে আগমন করিয়াছিল। অনন্তর এই অসুরদ্বয় যৌবনকাল প্রাপ্ত হইলে পরম পাবন পুষ্করতীর্থে পানাহার পরিত্যাগপূর্বক উৎকট তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। তাহারা যোগবিদ্যায় এতাদৃশ নিপুণ হইয়াছিল যে, এক স্থানেই একাসনে অযুত বর্ষকাল দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিল। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া হংসবাহনে তথায় আসিলেন। বিধাতা তাহাদিগকে

ধ্যানমগ্ন দেখিয়া বলিলেন, 'তোমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমরা উত্থিত হও। আমি সর্ব লোকের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি। অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি বরদান করিব'। পিতামহের বাক্য শ্রবণে শুম্ভ ও নিশুম্ভ উত্থিত হইল এবং সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে প্রদক্ষিণান্তে প্রণাম করিল। তপক্লিষ্টতনু অসুর-দ্বয় দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া গদগদ স্বরে মধুর বাক্যে বলিল, 'হে দেব, ধরাতলে মৃত্যুভিন্ন গুরুতর ভয় নাই। সেই মৃত্যুভয় নিবারণার্থ আমাদিগকে অমর বর প্রদান করুন।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'ত্রিভুবনে কেহ কাহাকে অমরত্ব প্রদান করিতে পারে না। জন্মিলে অবশ্যই মৃত্যু হইবে এবং মরিলে আবার জন্মিবেই মুক্ত পুরুষ ব্যতীত অন্য সকলেই। ইহা বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি। অন্য বর প্রার্থনা কর।' অসুরদ্বয় বলিল, 'দেবতা হইতে মানব পশুপক্ষী পর্য্যন্ত সকল পুরুষের আমরা অবধ্য হইতে ইচ্ছা করি। অবলা নারী হইতে আমাদের কোন মৃত্যু ভয় নাই। এই বর প্রদান করুন।' অসুর-দ্বয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রসন্নমনে উহাদিগকে ব্রহ্মা অভিলষিত বর প্রদান করিয়া স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দানবযুগলও স্বভবনে ফিরিল এবং দৈত্যগুরু ভৃগুমুনিকে পুরোহিত করিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। মুনিবর ভৃগু শুভদিনে স্বর্ণময় সুন্দর সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া অসুররাজের নিমিত্ত প্রদান করিলেন। শুম্ভ জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করা হইল। শুম্ভ রাজা হইলে চণ্ডমুণ্ডাদি দৈত্যগণ তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইল। ধরাতলে সকল রাজ্য অসুরগণ বলপূর্ব্বক অধিকারে আনিল। নিশুম্ভ শচী-পতিকে পরাজয় করিবার জন্য বহু সেনা সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন পূর্বক যুদ্ধ করিল। দেবরাজ তাহার বক্ষে বজ্র প্রহার করায় সে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ভ্রাতার মূর্চ্ছা সংবাদ শ্রবণে

শুম্ভ সসৈন্যে সংগ্রাম করিয়া শচীপতিকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। তাহারা সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণাদি দেবগণের অধিকার গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্যে গমনপূর্ব্বক অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিলেন।

সেই দেবী মহালক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, বিপদকালে তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি তাঁহাদের সমস্ত মহাবিপদ তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিবেন। দেবীর উক্ত আশ্বাসবাণী স্মরণপূর্বক দেবগণ গিরিরাজ হিমালয়ে গমন করিয়া বিষ্ণুমায়ার এইভাবে স্তব করিলেন। দেবগণ বলিলেন, "দেবীকে, মহাদেবীকে, শিবাকে সতত প্রণাম। ভদ্রা রৌদ্রা নিত্যা গৌরী ধাত্রী জ্যোৎস্নারূপা দেবীকে প্রণাম। কল্যাণী সমৃদ্ধিরূপা, সিদ্ধিরূপা অলক্ষ্মী শর্বাণীকে প্রণাম। দুর্গা, দুর্গপারা, সর্বকারিণী, কৃষ্ণা, ধূম্রা দেবীকে প্রণাম। অতিসৌম্যা, অতিরৌদ্রা, জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবীকে প্রণাম। যে দেবী সর্বভূতে বিষ্ণুমায়া নামে শব্দিতা তাঁহাকে প্রণাম। যে দেবী সর্বভূতে চেতনারূপে, বুদ্ধিরূপে, নিদ্রারূপে, ক্ষুধারূপে, ছায়ারূপে, শক্তিরূপে, তৃষ্ণারূপে, ক্ষান্তিরূপে ও জাতিরূপে সংস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, বৃত্তিরূপে, স্মৃতিরূপে, দয়ারূপে, তুষ্টিরূপে, মাতৃরূপে ও ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যিনি সকল প্রাণীতে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিতা, এবং যিনি পৃথিবীর আদি পঞ্চস্থূল ও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের প্রেরয়িত্রী সেই বিশ্বব্যাপিনী দেবীকে প্রণাম। যিনি চিৎশক্তিরূপে এই জগতে পরিব্যাপ্তা তাঁহাকে নমস্কার। ব্রহ্মাদি দেবগণ পূর্বে যাঁহার স্তব করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র

মহিষাসুরবধরূপ অভীষ্ট প্রাপ্তি হওয়ায় প্রতিদিন যাঁহার পূজা করিতেন, উদ্ধত দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়া আমরা যে ঈশ্বরীকে সম্প্রতি স্তব করিতেছি এবং যাঁহাকে ভক্তিনত দেহে স্মরণ করিলে তিনি সেই ক্ষণেই আমাদের সকল বিপদ নাশ করেন সেইমঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন এবং আমাদের সকল আপদ বিনাশ করুন।"

দেবতাগণ যখন দেবীর স্তবাদিতে নিযুক্ত ছিলেন তখন তথায় তাঁহাদের সম্মুখে পার্বতী দেবী জাহ্নবীর জলে স্নানার্থ আগমন করিলেন। সেই শুভ্র দেবী ইন্দ্রাদি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন? তখন সেই দেবীর শরীর-কোষ হইতে শিবাদেবী সমুদ্ভূতা হইয়া বলিলেন—'নিশুম্ভাসুর কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত এবং শুম্ভাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত দেবগণ সমবেত হইয়া আমারই স্তব করিতেছেন।' শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয় তপোবলে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করেন যে, তাঁহারা দেব ও মানব সকল পুরুষের অবধ্য; কিন্তু অযোনিজা, অথচ পুংস্পর্শরহিতা স্ত্রীশরীরজা অলঙ্ঘ্যপরাক্রমা নারীর প্রতি আসক্তিবশতঃ কেবল তাঁহারই দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইবেন। যখন শুম্ভ ও নিশুম্ভের উপদ্রবে স্বর্গ ও মর্ত্য অস্থির হইল তখন তিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভ বিনাশার্থ মহাসরস্বতীকে প্রেরণ করিবার জন্য শিবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। মহাদেবের রহস্যে ক্রুদ্ধ হইয়া পার্বতী ক্রোধভরে গৌতমাশ্রমে গমনপূর্বক কঠোর তপস্যার প্রভাবে রজোগুণের আধিক্যবশতঃ ভুজঙ্গী কঞ্চুকের ন্যায় স্বীয় কৃষ্ণ কোষ পরিত্যাগ পূর্বক গৌরবর্ণা হইয়া গৌরী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। শিব-পুরাণ সংহিতায় উক্ত আখ্যায়িকা আছে, চণ্ডীতে নাই। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচরদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড চন্দ্রকান্তি সুমনোহরা অম্বিকাকে

দেখিতে পাইল। তাহারা শুম্ভ ও নিশুম্ভের সমীপে আসিয়া সেই চার্বঙ্গী সুমনোহরা দেবীকে পত্নীরূপে স্বগৃহে আনিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। শুম্ভ সুগ্রীব নামক মহাসুরকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। সুগ্রীব রমনীয় শৈলশিখরে গৌরীর নিকট উপনীত হইয়া শুম্ভের নিকট যাইবার জন্য তাঁহাকে বলিল। দূতবাক্য শ্রবণে ভদ্রা ভগবতী গম্ভীরা ও অন্তঃস্মিতা হইয়া বলিলেন —"তুমি সত্যই বলেছ, তুমি কিছুই মিথ্যা বল নাই। শুম্ভ ত্রিলোকাধিপতি এবং নিশুম্ভও ঈদৃশ শক্তিশালী হইতে পারে। কিন্তু আমি এই বিষয়ে পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা কিরূপে লঙ্ঘন করি? আমার প্রতিজ্ঞা এই—"যিনি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার দর্পচূর্ণ করিবেন এবং জগতের মধ্যে মৎতুল্য শক্তিশালী কেবল তিনিই আমার ভর্তা হইতে পারিবেন, অন্য কেহ নহে। অতএব মহাসুর শুম্ভ বা নিশুম্ভ এখানে আগমনপূর্বক আমাকে পরাজিত করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুক। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?" দৈত্যদূত সুগ্রীব দম্ভভরে বলিলেন, 'দেবী, আপনি অত্যন্ত গর্বিতা, আপনি আমার অগ্রে এরূপ কথা বলিবেন না। ত্রিভুবনে এমন কোন পুরুষ আছে যে, শুম্ভ ও নিশুম্ভের সম্মুখে দাড়াইতে পারে?" ঐইরূপে মহাসরস্বতীর সহিত শুম্ভদূতের কথোপকথন হইল।

দৈত্যরাজ দূতমুখে দেবীর বাক্য শুনিয়া সৈন্যনায়ক ধূম্রলোচনকে সসৈন্যে যাইয়া সেই দুষ্টাকে কেশাকর্ষণবিহ্বলা করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। ধূম্রলোচন তুহিনাচলে সংস্থিতা দেবীর সমীপবর্তী হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইবামাত্র অম্বিকাদেবী হুঙ্কারের দ্বারাই তাহাকে ভস্মীভুত করিলেন। দেবীর ক্রোধানলে ধূম্রলোচন দগ্ধ হইল। দেবীবাহন সিংহও ক্রুদ্ধ হইয়া মহোৎসাহে মুহূর্ত মধ্যে সমগ্র দেত্যসৈন্য ধ্বংস করিল। তখন শুম্ভাদেশে চণ্ডমুণ্ডপ্রমুখ দৈত্যগণ

দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। তাহারা হিমাচলশৃঙ্গে সিংহারূঢ়া স্বর্ণপ্রভা ঈষৎ হাস্যবদনা গৌরী দেবীকে ধরিবার জন্য উদ্যত হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন এবং ক্রোধে তাহার মুখমণ্ডল মসীবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার ভ্রুকুটীকুটীল ললাটফলক হইতে দ্রুতবেগে করালবদনা. অসিপাশিনী, বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা, নরমালা-বিভূষণা, দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসতিভৈরবা, অতিবিস্তারবদনা, জিহ্বাললনভীষনা, নিমগ্নারক্তনয়না, নাদাপূরিতাদিড্‌মুখা চামুণ্ডাদেবী বিনিক্রান্তা হইলেন। চণ্ডাদি দৈত্যগণ অতিতমোগুণী বলিয়া তাহাদের বধার্থ তামসী কালিকার আবির্ভাব হইল। তিনি সবেগে অসুর-সেনামধ্যে ধাবিত হইয়া প্রধান অসুরগণকে বিনাশ করিতে করিতে অসুর সৈন্যসমূহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কাহাকেও কেশে, কাহাকেও বা গ্রীবাদেশে ধরিয়া মর্দিত এবং কাহাকেও বা পদদলিত করিলেন। অসুরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাশি কালী দন্তদ্বারা চর্বিত করিলেন। কৃষ্ণমেঘমধ্যস্থিত অসংখ্য সূর্য্য-বিম্বের ন্যায় অগণিত চক্র তাহার মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ভীষণ অট্টহাস্যে ভীমনাদিনী করালবদনা দুর্দর্শ দশনসমূহের প্রভায় তেজোময় হইল। তিনি খড়্গাঘাতে চণ্ড ও মুণ্ডকে বিনাশপূর্বক উহাদের মস্তকদ্বয় হস্তে লইয়া চণ্ডিকার নিকটে আগমনপূর্বক অট্টহাস্যমিশ্রিত বাক্যে বলিলেন, 'এই যুদ্ধযজ্ঞে চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় আপনাকে উপহার দিলাম। আপনি স্বয়ং শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিবেন।'

চণ্ডমুণ্ড নিহত হইলে শুম্ভ ও রক্তবীজপ্রমুখ অসুরগণসহ দেবীর সহিত যুদ্ধার্থ আসিল। অসুর সৈন্য সমাগত দেখিয়া চণ্ডিকা ধনুষ্টঙ্কার শব্দে ভূলোক ও ভুবর্লোক পূর্ণ করিলেন। ইত্যবসরে অসুরগণের নিধন এবং অমরগণের কল্যাণের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

বরাহ, নৃসিংহ, শিব, ইন্দ্র ও কার্তিকাদি দেবগণের অতিবীর্যবলান্বিত শক্তিসমূহ তাঁহাদের শরীর হইতে বহির্গতা হইয়া দেবগণের অনুরূপ দেবীমূর্তি ধারণপূর্বক চণ্ডিকার সমীপে গমন করিলেন। ইঁহারা স্বাতিরেকিনী দেবতা এবং স্ব স্ব দেবগণের তুল্য শক্তিমান্। টীকাকার নাগোজী ভট্ট তাই বলিয়াছেন, শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। যে দেবতার যাদৃশ আকার, ভূষণ ও বাহন তাঁহার শক্তিও তদ্রূপ আকার, ভূষণ ও বাহন গ্রহণপূর্বক অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। প্রথমে আসিলেন, হংসযুক্ত বিমানস্থা সাক্ষসূত্র-কমণ্ডলু ব্রহ্মাণী। ইনি ব্রহ্মার শক্তি। অনন্তর বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবর-ধারিণী মহাহিবলয়া চন্দ্ররেখাবিভূষণা মাহেশ্বরী আসিলেন। ইনি মহেশ্বরের শক্তি। এইরূপে শক্তিহস্তা ময়ূরবরবাহনা গুহরূপিণী কৌমারী, শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-খড়্গ-হস্তা গরুড়বাহনা বৈষ্ণবী, বিষ্ণু-শক্তি বারাহী, কেশর কম্পনে নক্ষত্রপুঞ্জ চঞ্চলকারী নারসিংহী, এবং ঐরাবতারূঢ়া সহস্রনয়না বজ্রহস্তা ঐন্দ্রী আসিলেন। তখন মহাদেব সেই সকল দেবশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিলেন, 'মৎপ্রতি প্রীতিবশতঃ ইহাদের সহযোগে আপনি শীঘ্র অসুরগণকে বিনাশ করুন।'

অনন্তর দেবীর দেহ হইতে অতিভীষণা, অত্যুগ্রা, অসংখ্য ঘোররবা শৃগালীবেষ্টিতা চণ্ডিকাশক্তি আবির্ভূতা হইলেন। সেই অপরাজিতা দেবী দেবী ধূম্রবর্ণ জটাধারী মহাদেবকে বলিলেন, 'ভগবান্! আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট দূতরূপে গমন করুন। তাহাদিগকে বলুন, পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের অধিপতি হউন এবং দেবগণ যজ্ঞাহুতি ভোগ করুন। যদি তোমরা বাঁচিতে ইচ্ছা কর তবে পাতালে প্রবেশ কর। আর যদি গর্ববশতঃ তোমরা যুদ্ধাকাঙ্খী হও তবে যুদ্ধ কর। আমার শৃগালীগণ তোমাদের মাংস

ভক্ষণ পূর্বক পরিতৃপ্ত হউক।’ সাক্ষাৎ শিবকে দেবী দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া এই জগতে তিনি শিবদূতী নামে প্রসিদ্ধা। মহাসুরগণ শিবমুখে শিবদূতীর বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ কাত্যায়নী দেবীর অভিমুখে ছুটিল। মূল শক্তির অভেদে শিবদূতীরও কাত্যায়নীত্ব সূচিত হইল। ব্রহ্মাণী স্বীয় কমণ্ডলুর প্রণবপূত জল সিঞ্চন দ্বারা অসুরগণকে বীর্য্যহীন ও ওজঃ শূন্য করিলেন। অন্যান্য মাতৃকাগণ স্ব স্ব অস্ত্রদ্বারা অসুর সৈন্যগণকে মথিত ও মর্দিত করিলে তাহারা চারিদিকে পলায়ন করিল। তখন মহাবীর রক্তবীজ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ দেবীর সম্মুখীন হইল। রক্ত-বীজের দেহ হইতে পতিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে রক্তবীজবৎ দেহধারী ও বলশালী এক এক অসুর উৎপন্ন হইল। রক্তবীজের রক্তজাত অসুরগণ অষ্ট মাতৃকার সহিত ভীষণভাবে যুদ্ধ করিল। তাহারা অসংখ্য ও অজেয় হওয়ায় দেবগণ ভীত হইলেন। দেবগণকে শঙ্কিত দেখিয়া চণ্ডিকা হাস্য করিয়া চামুণ্ডাকে বলিলেন, ‘শীঘ্র বদন বিস্তৃত করিয়া রক্তবীজের দেহনিঃসৃত রক্ত এবং রক্তবিন্দুজাত অসুরগণকে ভক্ষণ কর।’ চণ্ডিকা তদ্রূপ করায় রক্তবীজ রক্তহীন এবং পরে নিহত হইল।

রক্তবীজ নিহত হইলে শুম্ভ নিশুম্ভ দেবীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। নিশুম্ভাসুর ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিল। শূলটী আসিতে আসিতে দেবীর মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ হইল। দেবীর বাণা-ঘাতে নিশুম্ভ আহত ও ভূপাতিত হওয়ায় ভীমবিক্রম শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। শুম্ভ রথারূঢ় হইয়া অনুপম সুদীর্ঘ অষ্ট হস্তে পরমাস্ত্রসকল ধারণপূর্বক সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া শোভা পাইতে লাগিল। দেবী শুম্ভকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি ও অতীব দুঃসহ ধনুষ্টঙ্কার করিলেন। দেবীর

ঘণ্টাশব্দে দশদিক পূর্ণ হইল। সেই ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে অসুরগণ বল-হীন হইলেন। অনন্তর সিংহও মহাগর্জন দ্বারা আকাশ, বাতাস ও পৃথিবী কম্পিত করিল। শিবদূতী শত্রুগণের ভীতিজনক মহা অট্ট-হাস্য করিলেন। এইরূপে যুদ্ধ চলিবার পর চণ্ডিকার শূলাঘাতে শুম্ভ মূর্চ্ছিত ও ভূমিতে পতিত হইল। নিশুম্ভের শূলবিদ্ধ হৃদয় হইতে মহা-বল মহাবীর্য্য অপর এক মহাসুর বহির্গত হইল। দেবী অট্টহাস্য পূর্বক খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছিন্ন করিলেন। শান্তনবী টীকাতে এই দেবীবাক্যটী আছে—'মায়া সর্বাপি মন্ময়ী' অর্থাৎ সমুদয় মায়া আমা হইতে উৎপন্না। মন্ময়ী মায়া অবলম্বন করিয়া আমাকেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ।' এইরূপ ভাবিয়া দেবী উক্ত অসুরকে বিনাশ করিলেন। মহামায়ার শরণাগত ব্যতীত মায়ামুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই। মায়াশক্তির সহিত যিনি সংগ্রাম করিবেন তিনিই মায়াগ্রস্ত হইবেন। শেষে চণ্ডিকা অতিবেগে ঘূর্ণিত স্বীয় শূল দ্বারা শূলহস্তে আগমনকারী দেবশত্রু নিশুম্ভের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। পলায়নকারী অসুরগণ কালী, শিবদূতী ও পশুরাজ সিংহ দ্বারা আহত, খণ্ডিত, মর্দিত ও ভক্ষিত হইল।

প্রাণসম্মিত ভ্রাতা নিশুম্ভ নিহত হইলে শুম্ভ ক্রোধভরে দেবীকে বলি-লেন, 'হে বলগর্বে উদ্ধতা দুর্গা, তুমি গর্ব করিও না। কারণ, অতিগর্বিতা হইয়াও তুমি অন্যান্য দেবীর সহায়তায় যুদ্ধ করিতেছ।' তখন চণ্ডিকা বলিলেন, 'একা মাত্র আমিই এই জগতে বিরাজিতা। মদ্ব্যতিরিক্ত আমার সহায়ভূতা অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে? রে দুষ্ট, ব্রহ্মাণী-প্রমুখ দেবীগণ আমারই অভিন্না বিভূতি। এই দ্যাখ, ইহারা আমাতেই বিলীনা হইতেছে।' চণ্ডীই বিশ্বে একা, অদ্বিতীয়া। তিনি স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদহীনা। অনুভূয়মান ভেদ বাস্তব

নহে, মায়িক। শান্তনবী টীকাতে আছে, 'আমি জগৎ হইতে পৃথক নহি ; এবং জগৎ মদ্ব্যতিরিক্ত নয়। আমি ও জগৎ শক্তিতঃ অভেদ বলিয়া মদ্ব্যতিরিক্তা দ্বিতীয়া কেহ জগতে নাই। যেমন দধি দুগ্ধময় এবং এক দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত তদ্রূপ একা আমিই জগন্ময়ী এবং জগৎও মন্ময়ী।' অনন্তর অষ্টমাতৃকা আদ্যাদেবীর শরীরে বিলীনা হইলেন। কারণ, তাহারা মূল শক্তি হইতে অভিন্না। অম্বিকা স্বীয়া মায়াশক্তির প্রভাবে এই সকল দেবীরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন অম্বিকা একাকিনীই যুদ্ধক্ষেত্রে রহিলেন। অনন্তর সমস্ত দেবতা ও অসুরগণের সমক্ষে দেবী ও শুম্ভ দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বাণবৃষ্টি, শাণিত শস্ত্র ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা যে তুমুল যুদ্ধ চলিল তাহাতে সকল ভুবন সন্ত্রস্ত হইল। কখনও ভূমিতে, কখনও বা আকাশে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। চণ্ডিকা শুম্ভকে কন্দুকবৎ শূন্যে তুলিয়া ঘুরাইলেন এবং ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর শুম্ভ নিহত হইল। তখন দেবগণ আনন্দমগ্ন হইলেন। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান ধরিলেন। অন্য সকলে মৃদঙ্গাদি বাজাইতে লাগিলেন এবং উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

শুম্ভাদি বধরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় অগ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রফুল্ল বদনে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া সেই কাত্যায়ণী দেবীকে এই ভাবে স্তব করিলেন : 'হে প্রসন্নার্তিহরে দেবী, হে অখিল জগন্মাতা, আপনি প্রসন্না হউন। হে দেবি, আপনি চরাচরের ঈশ্বরী, আপনি বিশ্ব পালন করুন। আপনি একাই জগতের আধারভূতা ও মহীস্বরূপে অবস্থিতা। হে অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে, আপনি জলরূপে এই বিশ্ব পালন করিতেছেন। আপনি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী শক্তি, বিশ্বের বীজ, ও পরমা মায়া। এই সমস্ত জগৎ আপনার

দ্বারা সম্মোহিত। আপনি প্রসন্না হইলে মুক্তিলাভ হয়। বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা আপনার অংশ। চতুঃষষ্টী কলাযুক্তা এবং পতিব্রত্য, সৌন্দর্য্যযুক্তা ও তারুণ্যাদি গুণান্বিতা সকল নারীই আপনার বিগ্রহ। আপনি ত্রিজগতের জননী এবং একাকিনীই বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজিতা। আপনিই সকল স্তুতিরূপা। আপনার স্তব আর আমরা কি করিতে পারি? আপনি সর্বভূতা ও সর্বমুক্তি প্রদায়িনী। আপনি সকলের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা, আপনি স্বর্গাপবর্গদা নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম। আপনি কলাকাষ্ঠাদিরূপে পরিণামপ্রদায়িনী এবং জগতের সংহারসমর্থা শক্তিরূপিণী, আপনাকে প্রণাম। হে সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে সর্বার্থসাধিকে শিবে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। হে গুণাত্রয়ে অগুণময়ী, নারায়ণি, আপনি সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের শক্তিভূতা সনাতনী, আপনাকে প্রণাম। হে সর্বাতিহরে নারায়ণি, আপনি শরণাগত দীনের পরিত্রাণ পরায়ণা, আপনাকে প্রণাম। হে হংসযুক্ত-বিমানস্থা ব্রাহ্মাণীরূপধারিণী, হে কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি, আপনাকে প্রণাম। হে ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরা, মহাবৃষভবাহিনী মাহেশ্বরীস্বরূপা নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। হে ময়ূরকুক্কুটাবৃতা মহাশক্তিধরা কৌমারীরূপা অনঘা নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। হে শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গধরা বৈষ্ণবীরূপা দেবি আপনাকে প্রণাম। .... ইত্যাদি" এইরূপে স্তব করিয়া দেবগণ বলিলেন, 'হে বিশ্বার্তিহারিণী দেবী, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। ত্রিভুবনবাসিগণের আরাধ্যা দেবি, আপনার চরণে প্রণত দেবগণের প্রতি আপনি বরদা হউন!"

দেবগণের স্তবে তুষ্টা হইয়া দেবী বলিলেন,' আমি তোমাদের প্রতি বরদা হইয়াছি। জগতের উপকারক যে বর প্রার্থনা করিবে তাহাই প্রদান করিব।' দেবগণ প্রার্থনা করিলেন, 'অখিলেশ্বরি, আপনি এখন

আমাদের শত্রুবিনাশ দ্বারা যেরূপে ত্রিভুবনের সকল বিঘ্নের প্রশমন করিলেন সেইরূপ ভবিষ্যতেও করিবেন।' ভবিষ্যতে দেবী শতাক্ষী শাকম্ভরী, ভ্রামরী, ভীমা, রক্তদন্তিকাদি রূপে ছয়বার অবতীর্ণা হইবেন। গুপ্তবতী টীকার মতে শতাক্ষী শাকম্ভরী প্রভৃতি দেবীর স্থান কৃষ্ণাবেণী ও তুঙ্গভদ্রা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সহ্যাদ্রি পর্বতের ঈষৎপূর্বে প্রসিদ্ধা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ে চণ্ডীপাঠ বা চণ্ডী-শ্রবণের মাহাত্ম্য দেবী স্বয়ং বর্ণনা করিতেছেন। দেবী বলিলেন, "যে ব্যক্তি এই সকল স্তব দ্বারা অনন্য মনে নিত্য আমার স্তব করিবে আমি তাহাকে ঐহিক ও পারত্রিক সকল বিপদ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত করিব।' চণ্ডীমাহাত্ম্যের কীর্তন দেবী এইরূপে উপসংহার করিলেন, 'আমার এই মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে পাঠক বা শ্রোতা আমার সান্নিধ্য লাভ করে। পশুবলি, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি উপচার এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি দ্বারা এক বৎসর আমার পূজা করিলে আমি যেরূপ প্রসন্না হই আমার এই মাহাত্ম্য একবার মাত্র শ্রবণে আমি সেইরূপ প্রীতিলাভ করি।' এই বলিয়া ভগবতী চণ্ডিকা দর্শনকারী দেবগণের সম্মুখেই অন্তর্হিতা হইলেন।

মেধা ঋষি তখন রাজা সুরথকে বলিলেন, "হে ভূপ, সেই ভগবতী দেবী নিত্যা হইয়াও পুনঃ পুনঃ এইরূপে আবির্ভূতা হইয়া জগতের পরিপালন করেন। সেই দেবীই জগৎ মায়াবদ্ধ করেন এবং তাঁহার দ্বারাই এই জগৎ মায়ামুক্ত হয়। তাঁহাকে নিষ্কাম ভাবে আরাধনা করিলে তিনি অযাচিত ভাবে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। তাঁহাকে সকাম উপাসনা দ্বারা তুষ্ট করিলে তিনি ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। সেই সনাতনী দেবীকে গন্ধ ও পুষ্প, ধূপ ও দীপাদি উপচারে পূজা ও স্তব করিলে তিনি ধনপুত্রাদি, ধর্মে মতি ও দেহান্তে শুভ গতি দান করেন।"

মেধা ঋষির নিকট দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণে সুরথ ও সমাধি

আশান্বিত ও পুলকিত হইলেন। তাঁহারা ঋষিকে প্রণতিপূর্বক সেইক্ষণেই দেবীর আরাধনার্থ গমন করিলেন। তাঁহারা জগন্মাতার সন্দর্শন মানসে নদীতীরে অবস্থানপূর্বক দেবীসূক্ত আবৃত্তি ও অনুধ্যান করিতে করিতে তপস্যারত হইলেন। উভয়ে নদীপুলিনে মহীময়ী মূর্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণ দ্বারা দেবীর আরাধনা করিলেন। তাহারা কখনও নিরাহার, কখনও বা অল্পাহারী হইয়া সমাহিত চিত্তে স্বদেহরক্তসিঞ্চিত বলি এবং অন্যান্য পূজোপহার দেবীর চরণে নিবেদন করিলেন। তিন বৎসর এইরূপে সংযতচিত্তে দেবীর আরাধনার ফলে জগদ্ধাত্রী পরিতুষ্টা হইলেন, এবং প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, 'হে সুরথ, হে সমাধি, তোমরা উভয়ে আমার নিকট যাহা যাহা প্রার্থনা করিতেছ তৎসমুদায় পাইবে। আমি সন্তুষ্টা হইয়া তোমাদিগকে সেই সকল প্রদান করিব।' অনন্তর রাজা সুরথ জন্মান্তরে সাবর্ণি মনুরূপে চিরস্থায়ী রাজ্য এবং এই জন্মে স্বীয় শক্তি প্রভাবে শত্রু বিনাশপূর্বক অপহৃত স্বরাজ্যোদ্ধার প্রার্থনা করিলেন; এবং বুদ্ধিমান ও বৈরাগ্যবান বৈশ্য সমাধি সংসারাসক্তি নাশক মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান চাহিলেন। জগন্মাতা উভয়কে স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রদান করিয়া এবং তাহাদের দ্বারা ভক্তিভরে সংস্তুতা হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন।

মৃন্ময়ী প্রতিমাতে দেবীর আরাধনা যেভাবে সুরথ ও সমাধি করিয়াছিলেন তাহাই বঙ্গদেশে সহস্রাধিক বৎসর প্রচলিত। সচন্দন পুষ্পাদি দ্বারা দেবীর আরাধনা করিলে জগন্মতা প্রতিমাতে আবির্ভূতা হইয়া গ্রহণ করেন তাহা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বর্ত্তমান যুগে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছেন। পটে বা প্রতিমাতে সরস্বতী, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজা করিলে ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লাভ হয়। সুরথের উপাসনা সকাম ছিল। তাই তিনি অভীপ্সিত ঐহিক ও

পারত্রিক অভ্যুদয় লাভ করিলেন। সমাধি নিষ্কাম আরাধনার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। চণ্ডিকা প্রসন্না হইলে ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়। প্রত্যেক বৎসরে এইরূপে দেবী-পূজার দ্বারা আমরা শক্তিসাধনা করিয়া ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে সমুন্নত করি।

চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্ত পঠিত হয়। উক্ত সূক্তে আছে, অম্ভৃণ ঋষির কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ জগদম্বাকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমিই রাষ্ট্রী, আমিই জগদীশ্বরী। বেদান্তের মহাবাক্য যেমন সোঽহম্, তন্ত্রের মহাবাক্য তেমনি সাঽহম্। উভয় মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব একই। শরণাগতি ও ভক্তি সুপক্ক হইলে জগজ্জননীর সহিত মানবসন্তানের ঐক্যানুভূতি আসে। জগন্মাতার শরণাগত হইলেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে। ওঁ মা

ছয়

রুদ্রচণ্ডী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুকরণে যেমন অনুগীতা, পাণ্ডবগীতা ও গুরুগীতা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তেমনি শ্রীশ্রীচণ্ডীর অনুকরণে রুদ্রচণ্ডী ও চণ্ডীশতকের রচনা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে রুদ্রচণ্ডীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। ভবিষ্যতে কবি বাণভট্টের চণ্ডী-শতক সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রুদ্রচণ্ডী ও চণ্ডীশতক শ্রীশ্রীচণ্ডী অবলম্বনে রচিত। শ্রীশ্রীচণ্ডী যেমন মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত, রুদ্রচণ্ডী তেমনি রুদ্রযামল তন্ত্রের অংশভূত। রুদ্রযামলতন্ত্রের পুষ্পিকাকল্পের তূর্য্যখণ্ডে রুদ্রচণ্ডী আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, রুদ্রযামলনামক আগমসন্দর্ভ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনেক পরে সৃষ্ট। রুদ্রচণ্ডীর পাঠ কোন কোন স্থানে এখনও দেখা যায়। কোন কোন তন্ত্রমতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপর শিবের অভিশাপ পতিত হইয়াছিল। সেইজন্য শাপোদ্ধার মন্ত্রও আছে। উক্ত মন্ত্র পাঠান্তে চণ্ডীকে শাপমুক্ত করিয়া চণ্ডীপাঠ করিলে যথোক্ত ফলপ্রদ হয়। রুদ্রচণ্ডীর উপর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মার শাপ পড়িয়াছে। ইহার শাপ বিমোচন মন্ত্র শ্রীশ্রীচণ্ডীর শাপোদ্ধার মন্ত্র হইতে পৃথক। উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া রুদ্রচণ্ডীকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রার্থনা করিতে হয়।

ওঁ রুদ্রচণ্ডি নমস্তুভ্যং চণ্ডবৈরিবিনাশিনি।
সর্ব্বপাপহরে দেবি সর্ব্বদা বরদা ভব॥

রুদ্রচণ্ডীর গায়ত্রী যথাঃ ওঁ রুদ্রচণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে পূর্ণফল-প্রদায়িন্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। রুদ্রচণ্ডীর ধ্যান যথা :

রক্তবর্ণাং মহাদেবীং লসচ্চন্দ্রসুশোভিতাম্।
পট্টবস্ত্রপরিধানাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্॥
বরাভয়করাং দেবীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥ ১
কোটিচন্দ্রসমাভাসাং বদনৈঃ শোভিতাং পরাম্।
করালবদনাং দেবীং কিঞ্চিজ্জিহ্বাগ্রলোহিতাম্॥ ২
স্বর্ণবর্ণমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্।
অক্ষমালাধরাং দেবীং জপকর্ম্মসমাহিতাম্॥ ৩

অনুবাদঃ যে মহাদেবীর কপালে অর্দ্ধচন্দ্র সুশোভিত, যিনি রক্তবর্ণা, পট্টবস্ত্রপরিহিতা ও সকল অলঙ্কারভূষিতা, যে পরাদেবীর হস্তে বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা এবং গলে মুণ্ডমালা, যাঁহার মুখমণ্ডল কোটি-চন্দ্রসম উজ্জ্বল ও জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ; যিনি করালবদনা ও স্বর্ণবর্ণ শিবোপরি দণ্ডায়মানা, যাঁহার হস্তে রুদ্রাক্ষমালা এবং যিনি শিবনাম জপে সমাহিতা, আমি সেই রুদ্রচণ্ডীর ধ্যান করি।

ধ্যানান্তে রুদ্রচণ্ডীকবচ পাঠ করিতে হয়। রুদ্রচণ্ডী কবচের ঋষি ভৈরব, ছন্দ অনুষ্টুপ, দেবতা রুদ্রচণ্ডিকা। এই কবচ পাঠ করিলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুবর্গ ফললাভ হয়। সাধক রুদ্রচণ্ডী পাঠের অধিকারী ও দিব্যদেহধর হন। কার্ত্তিকের প্রার্থনায় এই কবচ মহাদেব প্রকাশ করেন। রুদ্রচণ্ডী কবচে মাত্র ১৬টি শ্লোক আছে; উহা দেবী কবচ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কবচের সারাংশ এইঃ "চণ্ডিকা আমার অগ্রদিক ও ভবসুন্দরী আমার অগ্নিকোণ রক্ষা করুন। মহাদেব আমার দক্ষিণ কোণ ও পার্বতী নৈর্ঋত কোণ রক্ষা করুন। চণ্ডিকা আমার বারুণ কোণ ও চামুণ্ডা বায়ু কোণ রক্ষা করুন। ভৈরবী আমাকে উত্তরে এবং শঙ্করী

আমাকে ঈশানে রক্ষা করুন। পূর্বে শিবা, উর্দ্ধে মহেশ্বরী ও মূলাধারবাসিনী অনন্তা দেবী অধঃদেশে আমাকে রক্ষা করুন। মস্তকে মহাদেবী, ললাটে মহেশ্বরী, কণ্ঠে কোটীশ্বরী, হৃদয়ে নলকুবরী, নাভি ও কটিদেশ লম্বোদরী, উরুদ্বয়, জানুদ্বয় ও ত্বক মদলালসা, শুক্র মজ্জা অস্থি ও গুহ্য ভুবনেশ্বরী, এবং সকল সন্ধিস্থল উর্দ্ধকেশী রক্ষা করুন। ওঁ ঐঁ ঐঁ হ্রীঁং চামুণ্ডে স্বাহা—এই দশাক্ষরী মন্ত্ররূপিণী সিদ্ধবিদ্যা আমার আত্মা রক্ষা করুন।" দেবী দশ দিকে পরিব্যাপ্তা এবং আমার দেহের সর্বস্থলে অবস্থিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন; আমি সকল বিপদ মুক্ত হইয়া মায়ের অভয় ক্রোড়ে উপবিষ্ট—এই ভাব দেবীভক্তের হৃদয়ে বদ্ধমূল করাই কবচের উদ্দেশ্য। রুদ্রচণ্ডীর পঠনক্রমও রুদ্রযামল তন্ত্রে সাতটি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত তন্ত্রমতে রুদ্রচণ্ডী শিবোক্ত, দেবী কর্তৃক শ্রুত এবং গণেশ কর্তৃক লিখিত। পার্বতীর প্রার্থনায় প্রীত হইয়া শিব রুদ্রচণ্ডী ব্যক্ত করেন। রুদ্রচণ্ডীতে মাত্র ১৮৯টী শ্লোক আছে এবং উহা তিনটি অবচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অবচ্ছেদে ৪৭টি শ্লোক; উহাতে চণ্ডীরহস্য কথিত। দ্বিতীয় অবচ্ছেদে ৩৭টি শ্লোক ও ইহাতে সাধন-রহস্য কথিত এবং তৃতীয় অবচ্ছেদে ১০৫টি শ্লোক আছে। রুদ্রচণ্ডীর ঋষিগণ ব্রহ্মাদি, ছন্দ অনুষ্টুপ এবং দেবতা রুদ্রচণ্ডিকা। চতুর্বর্গ সাধনে রুদ্রচণ্ডিকা পাঠের বিনিয়োগ হয়। রুদ্রচণ্ডীর প্রথম অবচ্ছেদে শ্রীশ্রীচণ্ডী বর্ণিত উপাখ্যানটি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। রুদ্রচণ্ডী ব্যক্ত করিবার পূর্বে মহাদেব মহাদেবীকে বলিতেছেন—দ্বিতীয় মন্বন্তরের চৈত্রবংশজাত রাজা সুরথ কিরূপে অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি সূর্যসম্ভব সাবর্ণি হইলেন তাহা তোমাকে পূর্বে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা মনোযোগ দিয়া শুন নাই। কান্তে, আবার তোমাকে আশ্চর্য্য সৌরথ উপাখ্যান বলিতেছি। মহাদেব পূর্বে শব্দ দ্বারা

সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা উল্লেখ করিতেছেন। অর্জুন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিস্মৃত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন পুনরায় অনুগীতা প্রকাশ করেন, মহাদেব তেমনি রুদ্রচণ্ডী ব্যক্ত করেন। ভগবদ্গীতার সহিত অনুগীতার যে সম্বন্ধ, শ্রীশ্রীচণ্ডীর সহিত রুদ্রচণ্ডীর সেই সম্বন্ধ মনে হয়! রুদ্রচণ্ডীর প্রথম অবচ্ছেদে কোলাগণ কর্তৃক সুরথের পরাজয় ও অমাত্যগণ দ্বারা উৎপীড়ন এবং মৃগয়াচ্ছলে বনে গমন, সমাধির সহিত সাক্ষাৎ, মেধা ঋষির আশ্রমে উপস্থিতি এবং ঋষির সহিত আলাপ, ঋষি কর্তৃক মহামায়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা, সুরথ ও সমাধি কর্তৃক বাৎসরত্রয় মহামায়ার মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা, দেবীর দর্শনলাভ ও বরপ্রাপ্তি প্রভৃতি সকল কথা সংক্ষেপে বর্ণিত।

তৎপরে মহামায়া কিরূপে মহাকালী, মহালক্ষ্মী, ও মহাসরস্বতী রূপে মধুকৈটভ মহিষাসুর ও শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিলেন তাহাও কথিত হইয়াছে। বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত ও সরল। মহামায়া সর্ব্বশক্তি রূপিণী ও সহস্রভুজারূপে বর্ণিতা। মহামায়ামাহাত্ম্য বলিতে মহাদেব পঞ্চমুখ। মহামায়াতত্ত্বই শ্রীশ্রীচণ্ডীর ন্যায় রুদ্রচণ্ডীতেও গীত। প্রথম অবচ্ছেদের অন্তে রুদ্রচণ্ডী পাঠের ফল বলা হইয়াছে।

রুদ্রচণ্ডীর মধ্যম অবচ্ছেদে সাধনরহস্য বর্ণিত। প্রথমে রুদ্রচণ্ডীর রহস্য এই ভাবে উক্ত হইয়াছে ঃ

"রুদ্রচণ্ডী মহাপুণ্যা ত্রিগুণাখ্যা বিধাতৃকা।
তারিণী তরণী তন্বী তান্ত্রিকা বিশ্বরূপিকা॥ ১
বিরোধিনী বিপ্রচিত্তা বাণী বর্ণাববোধিকা॥
বাসিনী বনিতা বিদ্যা বরারোহা বিমোহিনী॥ ২
বগলা শঙ্করী শান্তি শুভা ক্ষেমঙ্করী দয়া।
মোহাত্মিকা মনোরূপা সিতা মায়া মলাপহা॥ ৩
মাতা ভগবতী শক্তিঃ শিবা সাধ্যা সুরেশ্বরী।
শর্ব্বাণী সিংহসংবাহা শম্ভুবক্ষস্থলাস্থিতা। ৪

উপরোক্ত শ্লোকাবলীর সংস্কৃত সরল ও সহজবোধ্য। তাই আর অনুবাদ দেওয়া হইল না। রুদ্রচণ্ডীকে মনোরূপা বলা হইয়াছে। উপনিষদেও আছে সাকার ব্রহ্ম 'মনসাভিকল্পা'। দেবীর মনোময়ী মূর্ত্তিই মৃন্ময়ীরূপে সৃষ্ট। ধ্যানে যে দেবী বা দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা মনছাঁচে গড়া। এখানে ধ্যানরহস্যের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ইঙ্গিত করা হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহাও এই অবচ্ছেদে উল্লিখিত। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যদি ভৌমবার পড়ে, সেই দিন রুদ্রচণ্ডী পাঠ প্রশস্ত এবং সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। শত অপরাজিতা পুষ্প এবং সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা রুদ্রচণ্ডীর পূজা সমাপনান্তে রুদ্রচণ্ডী পাঠ করিতে হয়। মধ্যম অবচ্ছেদে রুদ্রচণ্ডীর এই স্তবটী আছে ঃ

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥ ১
শিবে দুর্গে মহামায়ে ভীমে ভয়বিনাশিনি।
চণ্ডিকে চণ্ডদৈত্যঘ্নি সুরাধ্যক্ষে পরেশি তে॥ ২
নারায়ণি নারসিংহি বারাহি বরদে বরে।
শরণ্যে সর্ব্বদে দেবী দুর্গে দুর্গবিনাশিনি॥ ৩
কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মীতি ভাগ্যবান্।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং প্রসীদ পরমেশ্বরী॥ ৪

এই স্তবের প্রথম শ্লোকটী শ্রীশ্রীচণ্ডীর কীলকস্তবের দ্বিতীয় শ্লোক। অন্তিম অবচ্ছেদটী প্রথম ও মধ্যম অবচ্ছেদ অপেক্ষা বৃহৎ। এই অবচ্ছেদের প্রথম শ্লোকে শ্রীরুদ্রদেব বলিতেছেন ঃ

চণ্ডিকাং হৃদয়ে সদা স্মরণং যঃ করোত্যপি।
অনন্তফলমাপ্নোতি রুদ্রচণ্ডীপ্রসাদতঃ॥

অর্থাৎ যিনি রুদ্রচণ্ডীকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া স্মরণ করেন, তিনি দেবীর কৃপায় অনন্তফল লাভ করেন। দেবী হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা

আছেন—এই ভাবটী দৃঢ় করিয়া দেবীর চিন্তা করিতে হইবে।

দেবীভক্ত রামপ্রসাদ তাই দর্শন করিয়াছিলেন, 'মা বিরাজে সর্ব্বঘটে'। শ্রীশ্রীচণ্ডীও বলেন যে, দেবী চেতনারূপে সর্ব্বভূতে সংস্থিতা। গীতা এবং উপনিষদে একই গুহ্যতত্ত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। রুদ্রদেব সাধনার এই সঙ্কেত প্রদানান্তে কোন বারে চণ্ডীপাঠের বা চণ্ডীশ্রবণের কি ফল তাহা বর্ণনা করিতেছেন। তৎপরে একটী দেবীস্তুতি। যথা—

ঘোরচণ্ডী মহাচণ্ডী চণ্ডমুণ্ডবিখণ্ডিনী।
চণ্ডবক্ত্রা মহামায়া মহাদেববিভূষিতা॥ ১
রক্তদন্তা বরারোহা মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
তারিণী জননী দুর্গা চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা॥ ২
গুহ্যকালী জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা যামলোদ্ভবা।
শ্মশানবাসিনী দেবী রুদ্রচণ্ডী ভয়ানকা॥ ৩
রণঘণ্টা চণ্ডঘণ্টা রণরামা রণপ্রিয়া।
ভবানী ভদ্রকালী চ শিবা ঘোরা ভয়ানকা॥ ৪
বিরলা ভৈরবী নিদ্রা মায়া বুদ্ধিঃ স্মৃতিঃ ক্ষমা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা ছায়া মহামায়া মনোহরা॥ ৫
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৬
রুদ্রধ্যেয়া রুদ্ররূপা রুদ্রাণী রুদ্রবল্লভা।
রুদ্রভক্তা রুদ্রপূতা রুদ্রভূষাসমন্বিতা। ৭

পরে রুদ্রদেব রুদ্রচণ্ডীর মাহাত্ম্য বলিতেছেন। রুদ্রচণ্ডী পাঠে ও শ্রবণে সংসৃতি বন্ধ হয়। যিনি দুর্গাপ্রতিমাকে মৃন্ময়ীজ্ঞান করেন, যিনি রুদ্র যামলতন্ত্রকে এবং তদন্তর্গতা রুদ্রচণ্ডীকে পুস্তকজ্ঞান বা মন্ত্রকে অক্ষর জ্ঞান করেন তিনি নরাধম। প্রলম্বনামক দুর্দ্ধর্ষ অসুরের বধবৃত্তান্ত

এই অবচ্ছেদের মধ্যে আছে।

রুদ্রচণ্ডী শ্রীশ্রীচণ্ডীর সরল ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। রুদ্রচণ্ডী শ্রীশ্রীচণ্ডীর ছায়া অবলম্বনে রচিত। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভাব-গাম্ভীর্য্য ও ভাষা-মাধুর্য্য রুদ্রচণ্ডীতে নাই। রুদ্রযামলসম্মতা ও রুদ্রচণ্ডীতে উক্তা দেবীর আরাধনা অন্যান্য তন্ত্রসাধনার প্রতিধ্বনি মাত্র। রুদ্রচণ্ডীতে অভিনবত্ব কিছুই নাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীর সমধিক প্রচারোদ্দেশ্যেই রুদ্রচণ্ডীর উৎপত্তি। যখন দেশে দেবীপূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল, তখন শ্রীশ্রীচণ্ডীর মাহাত্ম্য সাধারণের নিকট কীর্ত্তন করিবার জন্যই রুদ্রযামল তন্ত্র রুদ্রচণ্ডীর রচনা করিয়াছেন।

সাত

বাংলা শাক্ত সাহিত্য

শাক্ত ভাবের স্রোত সমগ্র ভারত প্লাবিত করিলেও বাংলা দেশে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে। বাংলার ধর্মগঙ্গার বিষ্ণুভক্তি ও দেবী ভক্তি দুইটী প্রধান ধারা। প্রাচীনকাল হইতে বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ন্যায় শাক্ত সাহিত্য সমানভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। বহু শাক্ত শাস্ত্র (তন্ত্রগ্রন্থ) বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রের সার-স্বরূপা চণ্ডীর অনেক বঙ্গানুবাদ আছে। চণ্ডীর যে সকল বঙ্গানুবাদ বর্ত্তমান কালে হইয়াছে, তন্মধ্যে অবিনাশ শর্ম্মা, প্রাণেশকুমার প্রভৃতি কৃত অনুবাদ সমধিক জনপ্রিয়। সত্যদেব ঠাকুর কৃত চণ্ডীর বাংলা ভাষ্য 'সাধনসমর' সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের 'মা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ও শাক্ত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শ্রীমতিলাল রায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত "শক্তিপূজা" পুস্তকখানি ও প্রবর্ত্তক মাসিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত তাঁর চণ্ডীভাষ্য শাক্ত সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণের শাক্ত সঙ্গীত বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ্। ভারতের কেন, জগতের অন্য কোন সাহিত্যে এই সম্পদ্ নাই। যে ভাব-সম্পদের বলে বাংলা সাহিত্য জগতের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে, শাক্ত ভাব তাহাদের অন্যতম। বাংলার মুসলমান কবি কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত ভাব ও ভাষায় অভিনব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' নামক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, গত পাঁচ শত বৎসর বাংলা ভাষায় বিশাল শাক্ত সাহিত্য উৎপন্ন হইয়াছে। চণ্ডী, দুর্গা, অম্বিকা, অন্নদা, সরস্বতী, গঙ্গা, লক্ষ্মী ও ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশ্য এই পাঁচ শতকে বহু কাব্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূজা উপলক্ষে সাধারণ লোকে আগ্রহ করিয়া মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার পাঁচালী শুনিত! বাংলার ঘরে ঘরে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। বাংলার বৃন্দাবনতুল্য নবদ্বীপেও দেবী পূজা হইত! মহাপ্রভু: চৈতন্যদেব মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়াছিলেন। বাংলার বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস দেবী বাসলীর অনুরক্ত সেবক ছিলেন। উপরোক্ত ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের কথা'তে লিখিয়াছেন: "সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীমাহাত্ম্যসূচক প্রায় সকল কাব্যই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডী অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।...অষ্টাদশ শতাব্দীতেও চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা দুর্গা সপ্তশতী অবলম্বনে রচিত কাব্যের আদর আরও বেশী ছিল।" দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকা-মঙ্গল, অন্ধ কবি ভবানী প্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল, গোবিন্দ দাসের কালিকামঙ্গল, শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র বসুর দেবীমঙ্গল রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল, বলদুর্লভের দুর্গাবিজয়, হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল, এবং জগৎরাম বন্দ্য ও তৎপুত্র রামপ্রসাদ রচিত পঞ্চরাত্রি চণ্ডী অবলম্বনে রচিত। দীনদয়ালের দুর্গাভক্তিচিন্তামণি এবং দ্বিজ রামনিধির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী দেবীভাগবত পুরাণ অবলম্বনে লিখিত। দ্বিজ কালিদাসের কালিকামঙ্গল, সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের ভারতীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণজীবন মোদকের অম্বিকা-মঙ্গল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডী

পাঞ্চালিকা, জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডিকামঙ্গল, রামানন্দ গোস্বামীর চণ্ডীর গীত, কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল, নারায়ণ দেবের কালিকাপুরাণ প্রভৃতি কাব্য শাক্ত সাহিত্যের অন্তর্গত। শাক্ত সাধক রামপ্রসাদের প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীত ব্যতীত কালিকামঙ্গল নামে একখানি কাব্য আছে। উক্ত কালিকামঙ্গল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পরে রচিত। রামপ্রসাদ হালিসহরের সমীপে কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাধাকান্ত মিত্রের শ্যামাসঙ্গীত কাব্যও উল্লেখযোগ্য। উহা ১৬৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। রাধাকান্ত খাস কলিকাতার প্রাচীনতম কবি। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দুর্গামঙ্গল ১৮১৯ খ্রীঃ রচিত।

চণ্ডীমঙ্গল শীর্ষক বহু শাক্ত কাব্য এই সময়ে বিরচিত হয়। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত। মাণিক দত্ত সম্ভবতঃ উত্তর বঙ্গের মালদহ জেলার লোক ছিলেন। সপ্তগ্রামনিবাসী মাধবাচার্য্যের রচিত চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ। চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতাগণের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরাম প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার পিতা হৃদয় মিশ্র বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে দামিন্যা গ্রামের নিবাসী ছিলেন। শাসকগণের অত্যাচারে মুকুন্দরাম পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। রঘুনাথ রাজা হইবার পর তাঁহার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ শতাব্দীর অন্তে স্বপ্নে দেবী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। মঙ্গলচণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য। চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী এবং বণিক্ ধনপতির উপাখ্যান—এই দুইটী স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। এই দেবীমাহাত্ম্যকাহিনী কোনও সংস্কৃত

গ্রন্থে নাই; বাংলা দেশে প্রাচীনকাল হইতে ইহা প্রচলিত ছিল। কালকেতুর উপাখ্যানটি এইরূপ :

সুদরিদ্র কালকেতু সাধ্বী স্ত্রী ফুল্লরার সহিত ব্যাধবৃত্তি করিয়া অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। চণ্ডীদেবী সুন্দরী বালিকার বেশে তাহাদের গৃহে আবির্ভূতা হইয়া ধার্মিক দম্পতীকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন এবং তাহাদের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য একটি মূল্যবান্ অঙ্গুরী উপহার দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া কালকেতু প্রচুর অর্থ পাইল। তাহার দুর্গতি দূর হইল। সে ধনী হইল। কালকেতু তাহার রাজ্য হইতে বঞ্চক ভাঁড়ু দত্তকে বিতাড়িত করিয়া বিপদে পড়িল। ভাড়ু দত্তের ষড়যন্ত্রে প্রতিবেশী রাজার সহিত কালকেতুর যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কারারুদ্ধ হইল, কিন্তু দেবীকৃপায় কারামুক্ত হইয়া শান্তিতে ও সম্পদে আবার দিনযাপন করিতে লাগিল।

ধনপতির কাহিনীটি এই :

বণিক্ ধনপতি সিংহল বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে যাত্রা করিল। জাহাজ সিংহলের নিকটবর্ত্তী হইলে, ধনপতি সমুদ্রসলিলোপরি কমলেকামিনী দর্শন করিয়া ধন্য হইল। সে দেখিল—সমুদ্রবক্ষে বৃহৎ প্রস্ফুটিত কমলের উপর এক ষোড়শী কামিনী একটি হস্তীকে গ্রাস করিয়া পরক্ষণে উদ্গীর্ণ করিতেছে। ধনপতি সিংহলে পৌছিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদানান্তে তুষ্ট করিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিল। রাজাকে স্বয়ং দৃষ্ট 'কমলে 'কামিনীর' কথা বলিল, কিন্তু রাজাকে তাহা সমুদ্রগর্ভে দেখাইতে অসমর্থ হইয়া যাবজ্জীবন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। ধনপতির লহনা ও খুল্লনা নামক দুই পত্নী ছিল। লহনা নিঃসন্তানা ছিল। খুল্লনার গর্ভে যখন শ্রীমন্ত নামক পুত্র জন্মে, ধনপতি তখন সিংহল-প্রবাসী। শ্রীমন্ত বড়

হইয়া মাতার নিকট পিতার নিরুদ্দেশের সংবাদ পাইয়া পিতার অন্বেষণে যাইবার সংকল্প করিল। ধনপতির ন্যায় শ্রীমন্ত বাণিজ্য পোতে সিংহল যাত্রা করিল। সিংহলের উপকূলের নিকটে পিতার ন্যায় পুত্রের ও 'কমলে কামিনী' দর্শন হইল। সিংহল যাইয়া সেও পিতার মতই সিংহলরাজকে স্বদৃষ্ট অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। কিন্তু দৃশ্য দেখাইতে না পারিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে—রাজা তাহাকে বলিয়া রাখিলেন। বলা বাহুল্য, রাজাকে শ্রীমন্তও দৃশ্য দেখাইতে অক্ষম হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা পাইল। শ্রীমন্ত শূলবিদ্ধ হইবার জন্য মশানে আনিত হইল। এইবার পিতাপুত্রের প্রতি চণ্ডীদেবীর করুণা জন্মিল। দেবী শ্রীমন্তের অতিবৃদ্ধ পিতামহীবেশে রাজার নিকট তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিল। রাজা অস্বীকৃত হইলেন। দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহার ভূত-প্রেত-পিশাচ-সৈন্যকে রাজধানী আক্রমণ করিতে বলিলেন। দেবীসৈন্য দ্বারা রাজার সৈন্যদল অচিরে পরাস্ত হইল। রাজা দেবীশক্তির লীলা বুঝিয়া শ্রীমন্তকে কারামুক্ত করিলেন। পুত্র কারাগারে গিয়া পিতাকে মুক্ত করিল। অন্ধকারাগারে পিতাপুত্রে প্রথম মিলন হইল। রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিয়া শ্রীমন্ত পিতৃ-সমভিব্যবহারে বহু ধনসম্পত্তি লইয়া স্বীয় জন্মভূমি উজানী নগরে ফিরিয়া আসিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীমঙ্গলে এবং দ্বিজ জনার্দ্দনের মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালীতে শুধু ধনপতির উপাখ্যান আছে; কালকেতুর কাহিনী নাই। শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী গ্রন্থে এই জাতীয় সাহিত্যের অনেক তথ্য ও তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন।

মনসামঙ্গল কাব্য বাংলা ভাষার শাক্ত সাহিত্যের আর এক আবশ্যকীয় অংশ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ এবং

উত্তরবঙ্গের বহু কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। চট্টগ্রামনিবাসী কবি রামজীবন বিদ্যাভূষণের মনসামঙ্গল ১৭০৩-৪ খ্রীঃ বিরচিত। উত্তর বঙ্গের কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ১৭৪৪-৪৫ খ্রীঃ মনসার পাঁচালী রচনা করেন। পশ্চিম বঙ্গের দ্বিজ রসিকের মনসামঙ্গল সুবৃহৎ কাব্য। সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের মনসামঙ্গল, বীরভূমবাসী বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল, দিনাজপুর অঞ্চলের অধিবাসী জগৎজীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল, রামনারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলের ষষ্টিবর দত্ত ও দ্বিজ জানকীরামের মনসা মঙ্গলদ্বয় উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গে রচিত বহু মনসামঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে বংশীবদনের মনসামঙ্গলই শ্রেষ্ঠ। উহা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত। বংশীবদন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং মনসার পাঁচালী গাহিয়া অতিকষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। তাঁহার নিবাস ছিল মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটবাড়ী গ্রামে। বংশীবদনের পত্নীর নাম সুলোচনা। তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিল কন্যা চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী উত্তরাধিকার সূত্রে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, মনসামঙ্গল রচনায় বংশীবদন কন্যার সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন। মনসামঙ্গল শীর্ষক সমুদয় কাব্যের মধ্যে ক্ষেমানন্দের মনসা মঙ্গলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পশ্চিম বঙ্গে উক্ত কাব্য এখনও একাধিপত্য করিতেছে। ক্ষেমানন্দ নিজেকে অনেকস্থলে কেতকাদাস (অর্থাৎ কেতকার = মনসার, দাস = সেবক) রূপে পরিচয় দিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ে দামোদরের তীরবর্ত্তী কোন গ্রামে কায়স্থ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মনসামঙ্গল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত। গ্রামের জমিদার চন্দ্রহাসের পুত্র বলভদ্রের মৃত্যু হইলে গ্রামে অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হয়। উক্ত উপদ্রব হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি সপরিবারে গৃহত্যাগ করিয়া জগন্নাথপুরের জমিদার বিষ্ণুদাসের ভ্রাতার আশ্রয়ে বসবাস করেন।

মাঠের মাঝে একদিন ক্ষেমানন্দ কার্য্যোপলক্ষে সন্ধ্যার সময়ে যাইয়া ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পড়েন। তখন কতকগুলি সর্পের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি মনসা দেবীর স্মরণ করেন। দেবী নানারূপে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিয়া দর্শনদানে কৃতার্থ করেন। মনসা দেবী তাঁহাকে মনসামাহাত্ম্য রচনা ও প্রচার করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিতা হন। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে রচিত। বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে এক বৈদ্যবংশে বিজয় গুপ্তের জন্ম হয়। মনসা পঞ্চমীর দিন কবি মনসাদেবী কর্ত্তৃক মনসা মঙ্গল রচনা করিতে আদিষ্ট হন। তিনি তাঁহার কাব্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মনসামঙ্গল-রচয়িতা কাণা হরিদত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কবি বিপ্রদাসেরও একখানি মনসামঙ্গল আছে। বিপ্রদাসের নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমায় নাড়ুড়া-বট গ্রামে। কবিচন্দ্রের মনসা মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। কবিচন্দ্র মল্লভূমের পানুয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পিতা যষ্টিবর সেনের সহযোগিতায় গঙ্গাদাসও একখানি মনসা মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

মনসাপূজা বাংলাদেশে প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। মনসামঙ্গল কাহিনীও বাংলার নিজস্ব সম্পদ; কোন পুরাণে নাই। বাংলাদেশ হইতে এই কাহিনী বিহার ও মিথিলা হইয়া কাশী পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। সকল মনসামঙ্গলে একই কাহিনী বর্ণিত। কাহিনীটী এইরূপ :

মনসাদেবী সর্পদেবতা ও শিবের কন্যা। জন্মগ্রহণের পরে তিনি সর্পের উপর আধিপত্য পাইলেন। শিবগৃহিণী চণ্ডী মনসার প্রতি ঈর্ষান্বিতা হন। মনসা ও চণ্ডীর মধ্যে বিবাদ ও মারামারি হইল। উহাতে মনসা একটী চক্ষু হারাইলেন এবং মনের দুঃখে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন। জরৎকারু মুনির সহিত মনসার বিবাহ হইল। জরৎকারুর ঔরসে মনসার গর্ভে

আস্তিকের জন্ম হইল। রাজা পরীক্ষিৎ সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। পিতৃহত্যার পরিশোধ লইবার জন্য রাজপুত্র জনমেজয় সর্পসত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সর্পকূল নাশের সুদৃঢ় সঙ্কল্প করেন। সর্পগণ বিপদ আসন্ন দেখিয়া মনসার শরণাপন্ন হইল। মনসা আস্তিককে জনমেজয়ের নিকট পাঠাইয়া তাহাকে যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। অতঃপর মনসা চণ্ডীর নিকট প্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বীয় মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করিতে মনোনিবেশ করিলেন। এই কার্য্যে নেত্রবতী তাঁহার পরম সহায় হইলেন। অচিরে মনসাপূজা সমাজে প্রচলিত হইতে লাগিল। সেই যুগে গন্ধবণিকেরা সমাজে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। উক্ত সমাজের শীর্ষস্থানীয় চাঁদ বেণের সহধর্মিণী সনকাকে নেত্রবতী মনসা পূজা শিখাইলেন। ইহাতে চাঁদ বেণে বিরক্ত হইলেন। সনকা একদিন গোপনে মনসাপূজা করিতেছিল; চাঁদ বেণে তথায় আসিয়া পূজার দ্রব্য পায়ে ছুড়িয়া ফেলিলেন। মনসা ক্রুদ্ধা হইয়া চাঁদকে শাস্তি দিলেন। চাঁদের সাত পুত্র বহুমূল্যের বাণিজ্য দ্রব্য জাহাজে আনিবার সময়ে সমুদ্রে ডুবিয়া মরিল। কিন্তু চাঁদের মহাজ্ঞান ছিল। সেই মহাজ্ঞানের শক্তিতে চাঁদ সাত পুত্রকে বাঁচাইলেন। মনসা ছদ্মবেশে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করিলেন। পুনরায় চাঁদের ছয় পুত্র মরিল। তখন আর চাঁদ মৃত পুত্রদের বাঁচাইতে পারিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীন্ধর (লখিন্দর) বেহুলাকে বিবাহ করিবে, সব স্থির হইল। মনসার শাপে লৌহনির্ম্মিত ছিদ্রহীন বাসরঘরে সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু হইল। লখিন্দরের বিধবাপত্নী বেহুলা তেজীয়সী বালিকা ছিল। সে মৃত পতিকে বাঁচাইবার দৃঢ় সংকল্প করিল। লখিন্দরের মৃত দেহকে যখন গভীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, তখন বেহুলা তাহাকে একটি ভেলায় লইয়া একাকিনী ত্রিবেণীর দিকে ভাসিয়া চলিল। ত্রিবেণীতে নেত্রবতী ধোপানী-

বেশে কাপড় কাচিতেছিল। নেত্রবতীর সহিত বেহুলার পরিচয় ও সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। বেহুলা তাহার সঙ্গে স্বর্গে যাইল এবং তথায় নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট করিল। দেবতাগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মনসার কোপ কমিল এবং বেহুলা শ্বশুর চাঁদের দ্বারা মনসা পূজা করাইবার পণ করিতে মনসা লখিন্দরকে বাঁচাইল। বেহুলা পুনর্জ্জীবিত পতিকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিল। তখন চাঁদ ভক্তি-ভরে মনসার পূজা করিলেন। এইরূপে বাংলায় মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারিত হইল।

চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল ব্যতীত সরস্বতীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, গঙ্গা-মঙ্গল ও ষষ্ঠীমঙ্গল প্রভৃতি অন্যান্য শাক্ত কাব্য এই সময়ে বাংলাদেশে রচিত হয়। গঙ্গাধর দাসের কিরীটিমঙ্গল একখানি উৎকৃষ্ট শাক্ত কাব্য। ইহাতে কিরীটকোণার কিরীটেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্য বিবৃত আছে। সরস্বতীর মাহাত্ম্যবিষয়ক তিন খানি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি দ্বিজ বীরেশ্বর রচিত সরস্বতীমঙ্গল, দ্বিতীয়টি দয়ারাম রচিত সারদা-চরিত। বাসুদেবের কাব্য অতি ক্ষুদ্র। লক্ষ্মীমাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্যের মধ্যে দ্বিজ ধনঞ্জয়ের লক্ষ্মীমঙ্গল এবং গুণরাজ খান উপাধিক বৈশ্য শিবানন্দ করের কমলামঙ্গল উল্লেখযোগ্য। আমেদা-বাদে মহালক্ষ্মী দেবীর সুন্দর মূর্তি ও মন্দির আছে। লক্ষ্মীমঙ্গল ও সরস্বতীমঙ্গল কাব্যের অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গঙ্গারাম চক্রবর্তীর পুত্র রুদ্র-রাম চক্রবর্তী বিদ্যাভূষণ একখানি ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করেন। উক্ত কাব্যে ষষ্ঠীর উপাখ্যানের সহিত অন্য দুইটী কাহিনীও আছে। কৃষ্ণরাম দাসের একখানি ষষ্ঠীমঙ্গল আছে। ভারতচন্দ্র রায় গুণা-করের অন্নদামঙ্গল অতি সুন্দর কাব্য। উহা অন্নদামঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল এবং অন্নপূর্ণামঙ্গল এই তিনটী স্বতন্ত্র কাব্যের সমষ্টি। ভারত-চন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য রচয়িতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের

কবিগণের উপর তাঁহার প্রভাব সমধিক। হাওড়া ও হুগলী জেলার সীমান্ত ভুরশুটী পরগণার পোড়া বসন্তপুর গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার ছিলেন। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ইনি দরিদ্র হইয়া পড়েন এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে মুলাজোড়ে বাস করেন। ১৭৬১ খ্রীঃ আট চল্লিশ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কবি গঙ্গামঙ্গল রচনা করেন। ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গাবতরণ—এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাই উক্ত শাক্ত কাব্যের মূল কাহিনী। গৌরাঙ্গ শর্ম্মা, জয়রাম দাস, দ্বিজ কমলাকান্ত, শঙ্কর আচার্য্য এবং মাধব আচার্য্য এই পাঁচজনের প্রত্যেকের রচিত এক এক-খানি গঙ্গামঙ্গল আছে। উলানিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখুটীর গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী একখানি সুপাঠ্য শাক্ত কাব্য এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রচিত।

বাংলার শৈব ও বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ও শাক্ত প্রভাবমুক্ত নহে। শৈবযোগী সম্প্রদায়ের কাহিনীমতে সিদ্ধ মীননাথ দেবী কর্ত্তৃক মোহপ্রাপ্ত হন এবং শিষ্য গোরক্ষনাথের সাহায্যে উদ্ধারলাভ করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের প্রবাদানুসারে আগুদেব ও আদ্যাদেবী কর্ত্তৃক দেবাদি সৃষ্টি হইবার পর গৌরী নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। গৌরীর সহিত শিবের বিবাহ হয়। শিব ও গৌরী ক্ষীরোদসাগরে একটী মঞ্চে বসিয়া তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেছিলেন। মীননাথ মৎস্যরূপে সেই তত্ত্ব কথা শ্রবণ করায় গৌরী তাঁহাকে অভিশাপ দেন। বাংলায় বিদ্যাসুন্দর নামে যে সকল কাব্য প্রচলিত, তাহাদের উপাখ্যানে আছে—রাজপুত্র কুমারসুন্দর দেবীর বরপুত্র ছিলেন। রাজকন্যা বিদ্যার পিতা সুন্দরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলে দেবী আবির্ভূতা হইয়া সুন্দরকে রক্ষা করেন। পশ্চিম বঙ্গে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা প্রচলিত। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ বিবৃত : ধর্ম্ম (সনাতন ব্রহ্ম) আদ্যা শক্তিকে সৃষ্টি করিয়া বিবাহ করিলেন। কামপ্রভাবে ধর্ম্মদেব

যে কালকূট বিষ উদ্‌গীরণ করেন তাহা দেবী তিন গণ্ডুষে পান করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিবকে প্রসব করেন। ত্রিপুরা জেলার শালগ্রাম-নিবাসী সিদ্ধ শক্তিসাধক ভুবন রায়ের কালী-সঙ্গীত প্রসিদ্ধ। তাঁহার সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি দশ-মহাবিদ্যার মনোহর গান রচনা করিয়াছেন। ভুবন রায়ের মুসলমান শিষ্য গুল মহম্মদ মিঞা বিখ্যাত গায়ক ও বাদক ছিলেন। গুল মহম্মদের অনেক শ্যামাসঙ্গীত আছে। গুল মহম্মদ শেষ বয়সে গেরুয়া পরিয়া বৃক্ষতলবাসী হন। ইহার জামাতা আপ্তাব উদ্দিন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বংশীবাদক ছিলেন। আপ্তাব উদ্দিনের ভ্রাতাই জগদ্বিখ্যাত স্বরদবাদক আলাউদ্দিন। আলাউদ্দিন নৃত্যকলাবিৎ উদয়শঙ্করের সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আপ্তাব উদ্দিন সাধক মনোমোহন দত্তের শিষ্য। মনোমোহনের সঙ্গীতাবলী 'মলয়া' গ্রন্থে প্রকাশিত। গুল মহম্মদের বংশধরগণ এখনও কালীকীর্তন করেন। আন্দুলের কালীকীর্তনের নেতৃবৃন্দগণ অনেক কালীসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই সকল দেবীগীতি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইলে বাংলা ভাষায় শাক্ত সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে। বাংলার দেবীস্থানের ইতিহাস এবং দেবীসাধকগণের জীবনীও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। মেহারের সর্ব্বানন্দদেব, ঢাকা জিলার রসিংদী থানার নিকট চীনিশপুরের রামপ্রসাদ, কুমিল্লার রামকুমার মজুমদার, ত্রিপুরা রাজার দেওয়ান রামদুলাল নন্দী এবং ত্রিপুরার বরদাখাতের জমিদার মির্জা হোসেন আলি আধুনিকতম শক্তিসাধকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। মির্জা হোসেনের সাধনার স্থান চাঁদ-পুরের নিকট মচ্ছাখাল নারায়ণপুরে ছিল। মেহার ও চীনিশপুরের কালীবাড়ী সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত। রামদুলালের শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন "ত্রিপুরাতে এত বড় দার্শনিক আছেন!"

আট

বৌদ্ধ ধর্মে শক্তিবাদ

শক্তিবাদ ধর্মজগতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এক ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশই বিশ্বস্রষ্টাকে স্বীয় জননীজ্ঞানে পূজা করিয়া ধন্য হয় নাই। মাতৃভাবের এরূপ পূর্ণ বিকাশ ভারতবহির্ভূত প্রদেশে আর হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দুইটী সেমিটিক ধর্ম ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম প্রধানতঃ জগৎপিতার উপাসনায় পর্য্যবসিত। খৃষ্টধর্মে ঈশাজননী মেরি ম্যাডোনার পূজা প্রচলিত থাকিলেও উহা খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বের অঙ্গীভূত হয় নাই। প্রাচীন মিশরে দেবীপূজা প্রসিদ্ধ ছিল। পরন্তু উহাই মিশরকে পিরামিড্ বা মামি অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শক্তিবাদ মিশরে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইসলাম, পার্শীধর্ম ও তাওধর্মে শক্তিবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই বলিলেও চলে।

বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য তাঁহার Introduction to Buddhist Esotericism নামক গ্রন্থে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুগ হইয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দু বা বৌদ্ধ হউক, ভারতীয় ধর্মে শক্তিবাদ স্বদেশজাত নহে; উহা বিদেশ হইতে সম্ভবতঃ শক পুরোহিত ম্যাজীদের দ্বারা আমদানী। ইতিহাস এই মতের কতদূর সাক্ষী ও পরিপোষক, তাহা বলিতে পারি না। তবে বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগেও ভারতে শক্ত্যুপাসনার বিশেষ প্রচলন ছিল, এইরূপ জানা যায়। এমন কি, বৈদিক যুগেও যে শক্তিবাদের বীজ শুধু অঙ্কুরিত নহে, এমন কি পল্লবিত ও পুষ্পিত

হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় সামবেদীয় কেন উপনিষদে। তাহাতে কথিত আছে যে, ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপিনী বহুশোভমানা দেবী উমা হৈমবতী দেবতাদের গর্বচূর্ণ করিতে মরলোকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎসমক্ষে বায়ু যখন সর্বশক্তি প্রয়োগে একটি কুশাগ্র নাড়াইতে ও অগ্নি তৎপরে উহা দহন করিতে পারিলেন না তখন উমা হৈমবতী তাঁহাদের এই শিক্ষা দিলেন যে, অসুরদের উপর দেবগণের এই বিজয় ঐশী শক্তিতে হইয়াছে—স্বশক্তিতে নহে। ঋগ্বেদোক্ত মহর্ষি অম্ভৃণের বাক্ নামক ব্রহ্মবিদুষী কন্যা সমাধিতে বিশ্ব-শক্তির সহিত ঐক্য অনুভব করিয়া বলিলেন, "আমি ঈশ্বরী, ভগবতী, রাষ্ট্রী: আমি শক্তিরূপে সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্বজীবে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। আমিই জগতে সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ করি।" সুতরাং আমরা শক্তিবাদের উদ্ভব বৈদিক যুগেই পাই। শ্রেষ্ঠ বৈদিক মন্ত্র গায়ত্রীর আহ্বানে, গায়ত্রীকে ব্রহ্মযোনিরূপে স্তব করার প্রথা বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগেই সৃষ্ট। তবে এই বৈদিক শক্তিবাদ যে বৌদ্ধযুগে অসম্ভবরূপে পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত, তাহা নিঃসন্দেহ।

বাংলাই প্রাচীনকাল হইতে শক্তিসাধনার পাদপীঠ। এই বাংলার মাটীতেই বৌদ্ধ ধর্মের বজ্রযান শাখা বা বৌদ্ধতন্ত্র বিশেষরূপে পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধতন্ত্র হইতে হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টি না হউক, অন্ততঃ যে এই নবীন রূপ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। উত্তর ভারতে, বিশেষতঃ বাংলায়, সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তন্ত্রযুগের পুর্ণ প্রভাব চলিয়াছিল। প্রথমে বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দু দেবদেবীগণকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, পরে বৌদ্ধতন্ত্রের পূর্ণ সমৃদ্ধি হইলে হিন্দুতন্ত্র বৌদ্ধ তন্ত্রের সমগ্র 'প্যান্থিয়ন'কে গ্রাস করিয়া ফেলে। প্রসিদ্ধ হিন্দুতন্ত্র "তন্ত্রসার" "তারাতন্ত্র" "মহাচীন সারতন্ত্র" "রুদ্রযামল" "ব্রহ্মযামল" প্রভৃতি গ্রন্থে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা

আট

বৌদ্ধ ধর্মে শক্তিবাদ

শক্তিবাদ ধর্মজগতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এক ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশই বিশ্বস্রষ্টাকে স্বীয় জননীজ্ঞানে পূজা করিয়া ধন্য হয় নাই। মাতৃভাবের এরূপ পূর্ণ বিকাশ ভারতবহির্ভূত প্রদেশে আর হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দুইটী সেমিটিক ধর্ম ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম প্রধানতঃ জগৎপিতার উপাসনায় পর্য্যবসিত। খৃষ্টধর্মে ঈশাজননী মেরি ম্যাডোনার পূজা প্রচলিত থাকিলেও উহা খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বের অঙ্গীভূত হয় নাই। প্রাচীন মিশরে দেবীপূজা প্রসিদ্ধ ছিল। পরন্তু উহাই মিশরকে পিরামিড্ বা মামি অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শক্তিবাদ মিশরে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইসলাম, পার্শীধর্ম ও তাওধর্মে শক্তিবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই বলিলেও চলে।

বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য তাঁহার Introduction to Buddhist Esotericism নামক গ্রন্থে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুগ হইয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দু বা বৌদ্ধ হউক, ভারতীয় ধর্মে শক্তিবাদ স্বদেশজাত নহে; উহা বিদেশ হইতে সম্ভবতঃ শক পুরোহিত ম্যাজীদের দ্বারা আমদানী। ইতিহাস এই মতের কতদূর সাক্ষী ও পরিপোষক, তাহা বলিতে পারি না। তবে বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগেও ভারতে পঞ্চোপাসনার বিশেষ প্রচলন ছিল, এইরূপ জানা যায়। এমন কি, বৈদিক যুগেও যে শক্তিবাদের বীজ শুধু অঙ্কুরিত নহে, এমন কি পল্লবিত ও পুষ্পিত

হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় সামবেদীয় কেন উপনিষদে। তাহাতে কথিত আছে যে, ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপিনী বহুশোভমানা দেবী উমা হৈমবতী দেবতাদের গর্বচূর্ণ করিতে মরলোকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎসমক্ষে বায়ু যখন সর্বশক্তি প্রয়োগে একটি কুশাগ্র নাড়াইতে ও অগ্নি তৎপরে উহা দহন করিতে পারিলেন না তখন উমা হৈমবতী তাঁহাদের এই শিক্ষা দিলেন যে, অসুরদের উপর দেবগণের এই বিজয় ঐশী শক্তিতে হইয়াছে—স্বশক্তিতে নহে। ঋগ্বেদোক্ত মহর্ষি অম্ভৃণের বাক্ নামক ব্রহ্মবিদুষী কন্যা সমাধিতে বিশ্ব-শক্তির সহিত ঐক্য অনুভব করিয়া বলিলেন, "আমি ঈশ্বরী, ভগবতী, রাষ্ট্রী; আমি শক্তিরূপে সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্বজীবে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। আমিই জগতে সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ করি।" সুতরাং আমরা শক্তিবাদের উদ্ভব বৈদিক যুগেই পাই। শ্রেষ্ঠ বৈদিক মন্ত্র গায়ত্রীর আহ্বানে, গায়ত্রীকে ব্রহ্মযোনিরূপে স্তব করার প্রথা বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগেই সৃষ্ট। তবে এই বৈদিক শক্তিবাদ যে বৌদ্ধযুগে অসম্ভবরূপে পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত, তাহা নিঃসন্দেহ।

বাংলাই প্রাচীনকাল হইতে শক্তিসাধনার পাদপীঠ। এই বাংলার মাটীতেই বৌদ্ধ ধর্মের বজ্রযান শাখা বা বৌদ্ধতন্ত্র বিশেষরূপে পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধতন্ত্র হইতে হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টি না হউক, অন্ততঃ যে এই নবীন রূপ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। উত্তর ভারতে, বিশেষতঃ বাংলায়, সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তন্ত্রযুগের পুর্ণ প্রভাব চলিয়াছিল। প্রথমে বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দু দেবদেবীগণকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, পরে বৌদ্ধতন্ত্রের পূর্ণ সমৃদ্ধি হইলে হিন্দুতন্ত্র বৌদ্ধ তন্ত্রের সমগ্র 'প্যান্থিয়ন'কে গ্রাস করিয়া ফেলে। প্রসিদ্ধ হিন্দুতন্ত্র "তন্ত্রসার" "তারাতন্ত্র" "মহাচীন সারতন্ত্র" "রুদ্রযামল" "ব্রহ্মযামল" প্রভৃতি গ্রন্থে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা

ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যার যে বর্ণনা আছে, তৎসমুদায় যে বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত, তাহা বৌদ্ধতন্ত্র 'সাধন-মালা' পরিদৃষ্টে বুঝা যায়। উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ও তারা—এই অষ্ট রূপের মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। সরস্বতী ও কালী—বাংলার জনপ্রিয় এই দেবীদ্বয়ও বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি। হিন্দুদের অধিকাংশ তান্ত্রিক মন্ত্রই বৌদ্ধ তন্ত্রে সৃষ্ট মন্ত্রের অপভ্রংশ। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন বৈদিক প্রোটেষ্ট্যাণ্ট। তিনি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে দূর করিতে যাইলেন বটে, কিন্তু অঘটন-ঘটনপটীয়সী কালের এমন মহিমা যে, তাঁহার ধর্ম কালক্রমে গুপ্ত ক্রিয়াকলাপের ডিপো বা খনি হইয়া উঠিল। যে সিদ্ধাই বা অলৌকিকত্ব তিনি ধর্ম হইতে বর্জ্জন করিতে চাহিলেন তাঁহার জীবদ্দশাতেই উহা আবার তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীতে সংক্রামিত হইল। ব্রহ্মজালসূত্র ও বিনয়পিটকের মহাভাগে বিভূতিলাভের ক্রিয়া কলাপের বর্ণনা এবং বুদ্ধশিষ্যগণের অলৌকিক শক্তিলাভ ও প্রদর্শ-নের উল্লেখ আছে। পরে 'গুহ্যসমাজ' তন্ত্রে আমরা বৌদ্ধতন্ত্রের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাই। এই 'গুহ্যসমাজ' প্রথম বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ এবং সম্ভবতঃ ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীতে লিখিত হয়। এমন কি, পালিগ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব ছন্দ, বীর্য্য, বীমাংসা ও চিত্তম্ এই চারিটী উপায়ে বুদ্ধত্বলাভের উপদেশ দিতেছেন। সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে হীনযান শাখা অত্যন্ত অনুর্ব্বর ও মরুসম শুষ্ক। তাই হীনযান গতিহীন ও বৃদ্ধিহীন। কেবলমাত্র তিব্বত, চীন ও জাপান, কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখাই গতিশীল ছিল বলিয়া তৎতৎদেশে ইহা এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তন্ত্রই মহাযান শাখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। মহাসাঙ্ঘিকগণ স্থবিরগণের সঙ্কীর্ণতার জন্য বৌদ্ধ সংঘ

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মহাযানের সৃষ্টি করেন। আর প্রাচীন দল বা স্থবিরগণ হীনযান রহিয়া গেলেন।

'সন্ধিতির' আকারেই বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি। হিন্দুতন্ত্রে যেমন আছে যে, শিব পার্ব্বতীর নিকট গোপনে তন্ত্ররহস্য বিবৃত করিতেছেন, তদ্রূপ বৌদ্ধ তন্ত্রে আছে, ভগবান বুদ্ধ অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর সমক্ষে তন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরন্তু বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় তন্ত্রের উদ্দেশ্য একই। হিন্দু তন্ত্রের যেমন দক্ষিণাচার ও বামাচার নামক দুইটি বিভাগ আছে বৌদ্ধতন্ত্রের তদ্রূপ চারিটি বিভাগ। দক্ষিণাচারে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি পালন বাধ্যতামূলক। দক্ষিণাচারে পঞ্চ 'ম' কারের প্রবেশ নিষেধ। পরে সাধক উন্নত হইলে বামাচার অভ্যাস করিতে পারেন। বৌদ্ধতন্ত্রের ক্রিয়াতন্ত্র ও চর্য্যাতন্ত্র নামক প্রথম বিভাগ হিন্দু দক্ষিণাচারের মত শুদ্ধ। পরে যোগতন্ত্র। যোগতন্ত্র ঠিক বামাচারের মতই কঠিন। বামাচার বা যোগতন্ত্র যে অভ্যাস করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। তবে অনেক সাধকের সাধ্বী স্ত্রীলোকের সাহচর্য্য ব্যতীত সুপ্তকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন না। তন্ত্রশাস্ত্রের উপর আমরা অযথা যে দোষারোপ করি, তাহা নিতান্ত অমূলক ও অজ্ঞান প্রসূত।

হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের লক্ষ্য মুক্তি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন দ্বারা সমাধিতে সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্মবস্তুলাভই হিন্দুতন্ত্রের উদ্দেশ্য। জীবাত্মাকে বৌদ্ধগণ বোধিচিত্ত বলেন, আর পরমাত্মাকে বলেন মহাশূন্য। তাই বৌদ্ধতন্ত্রের লক্ষ্য বোধিচিত্ত ও মহাশূন্যের মিলন; ইহাই নির্ব্বাণ। তাই নির্ব্বাণে শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ—এই ত্রয়াত্মক অখণ্ড বস্তু লাভ হয়। বৌদ্ধ যোগী বলেন, নির্ব্বাণের সম চিত্তাকাশে মহাশূন্য হইতে সৃষ্ট বীজমন্ত্র দৃষ্ট হয়। এই এক একটি বীজ-মন্ত্র হইতে আকৃতিবিশিষ্ট দেবদেবীগণের আবির্ভাব। বৌদ্ধতন্ত্রমতে অসংখ্য দেবদেবী এই মহাশূন্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি। এই শূন্যই নিরাত্মা

এবং এই শূন্যই এক দেবী যাঁহার অখণ্ড আলিঙ্গনে বোধিচিত্ত তাঁহার ক্রোড়ে মহানাদনিদ্রায় চিরাভিভূত থাকেন।

হীনযানের আদর্শ ব্যক্তিগত মুক্তি। কিন্তু মহাযান প্রচার করিলেন, অপরের—দশের মুক্তি—সমষ্টির মুক্তির জন্য আত্মমুক্তি বলিদান করিতে হইবে। তাই মহাযানের আদর্শ অনন্তকরুণাময় অবলোকিতেশ্বর যিনি সুমেরু পর্ব্বতের চূড়ায় নির্ব্বাণ লাভের প্রাক্কালে জনৈক জীবের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন না শেষ জীবটী পর্য্যন্ত নির্ব্বাণের অধিকারী হইবে, ততদিন তিনি নির্ব্বাণ তুচ্ছ করিবেন। এই করুণাবাদই মহাযানের বিশেষত্ব। এই মুমুক্ষু বোধিসত্ত্ব জীবকল্যাণের জন্য গর্হিত কর্ম করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না।

বৌদ্ধতন্ত্র ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের নাম করেন। তাঁহারা ৭ম, ৮ম, ও ৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া সান্ধ্যভাষায় তন্ত্র প্রচার করেন। এই বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান তৃতীয় শতাব্দীতে মৈত্রেয়নাথ কর্ত্তৃক আরম্ভ হয়। তাহাদের মতে এই বাহ্য জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ অলীক এবং বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে জ্ঞেয়াবরণ ও ক্লেশাবরণ দূর করিতে হইবে। নির্ব্বাণ লাভের উপায় প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা হইতেছে জগতের অলীকত্বজ্ঞান, প্রজ্ঞা লাভের উপায় করুণা। এই দুই জ্ঞান লাভ হইলে নির্ব্বাণলাভ সহজ হয়। বাংলার কামাখ্যা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল।

বৌদ্ধতন্ত্রের মুদ্রা, মণ্ডলী, স্তব, হোম, সাধনা, ধারণী, মন্ত্র প্রভৃতির বিভিন্ন বিভাগ আছে। হিন্দুতন্ত্রের যেমন যামল ও আগম নামক দুইটি বিভাগ আছে, তেমন বৌদ্ধতন্ত্রেরও বজ্রযান, সহজযান ও কাল চক্রযান নামক তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। কালচক্রযানের বিস্তৃত দর্শন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ রুশদেশীয় তিব্বতীভাষায় পণ্ডিত ও প্রাচ্য

-তত্ত্ববিৎ ডাঃ জর্জ্জ রোরিক তাঁহার উরুস্বতী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বিভাগ ব্যতীত বৌদ্ধতন্ত্রের মন্ত্রযান, তন্ত্রযান, ভদ্রযান প্রভৃতি নানা অংশ আছে। কিন্তু বজ্রযানই প্রধানতঃ তন্ত্রসম্বন্ধীয়। বৌদ্ধতন্ত্রের মন্ত্র বিভাগের বেশ বাহুল্য আছে। যথা— বীজহৃদয়, উপহৃদয়, পূজা, অর্ঘ্য, পুষ্প, দীপ, ধূপ, নৈবেদ্য, নেত্র, শিখা, অস্ত্র, রক্ষা ইত্যাদি। বৌদ্ধ তন্ত্র-সাহিত্য অতীব বিশাল। উহার অধিকাংশই তাহাদের সিদ্ধাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক লিখিত এবং হস্তলিপির আকারে দেশবিদেশের লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত। সম্প্রতি কয়েকটি প্রধান তন্ত্র ভারতেও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুদ্ধকপালতন্ত্রের লেখক রাহুলভদ্র, নাগার্জুন, সবরপা, লুইপা, বজ্রঘণ্টা, কচ্ছপা, পদ্মবজ্র, ললিতবজ্র, জালন্ধররিপ, আনন্দবজ্র, ইন্দ্রভূতি, কৃষ্ণাচার্য্য. লীলাবজ্র, লক্ষিংকার, দ্বারিকাপাদ ও দোম্বি হেরুক প্রসিদ্ধ। দোম্বি হেরুক বলেন যে, নির্ব্বাণজাত মহাসুখের চারিটি প্রকার আছে :— আনন্দ, পরমানন্দ, বিরামানন্দ ও সহজানন্দ। কয়েক জন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তন্ত্রাচার্য্য বাঙ্গালী ছিলেন।

নির্বাণ ব্যতীত সিদ্ধাইলাভও তন্ত্রের এক প্রধান উদ্দেশ্য। সিদ্ধিগুলি এই : অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, প্রাপ্তি, ঈশিত্ব, বশীত্ব, কামাবসায়িতা, দূরশ্রবণ, পরকায়প্রবেশ, সর্বজ্ঞত্ব, বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, চিরজীবিত্ব, বাকসিদ্ধি, প্রাণদান প্রভৃতি চব্বিশটি। সিদ্ধি পাঁচ প্রকারের যথাঃ—তপোজ, সমাধিজ, ঔষধজ, জন্মজ ও মন্ত্রজ। বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান আটটি সিদ্ধি এই :—খড়গ, অঞ্জন, পাদলেপ, অন্তর্দ্ধান, রসরসায়ন, খেচর, ভূচর ও পাতাল। এতদ্ব্যতীত শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ লাভ করাও বৌদ্ধতন্ত্রের উদ্দেশ্য। মন্ত্রোচ্চারণের বিভিন্ন প্রকার আছে যাহাতে মন্ত্র বিভিন্ন-ফলদায়ক হয়। যথা— গ্রথন, বিদর্ভ, সম্পূত, রোধন, যোগ ও পল্লভ।

বিশেষ বিশেষ সিদ্ধির জন্য মন্ত্রসাধনের স্থান, কাল ও বিধি আছে। তন্ত্রসাধনের জন্য বৌদ্ধগণ গুরুকরণের অপরিহার্য্যতা স্বীকার করেন। গুরুকে ভগবান্ বুদ্ধের দ্বিতীয় মূর্ত্তিরূপে শ্রদ্ধা ও পূজা করা বিধেয়।

নির্বাণপথে বোধিচিত্ত দশ ভূমিতে আরোহন করে। দশটী ভূমি যথা— প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অরিষ্মতী, সদূরজয়া, অধিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতি ও ধর্ম্মমেধা। এইগুলি হিন্দুতন্ত্রের সপ্তভূমি মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার প্রভৃতির ন্যায়। বিশেষ বিশেষ দেবদেবীকে ধ্যানান্তে ধ্যেয় বস্তুর সহিত ধ্যাতার ঐক্য চিন্তা বৌদ্ধতন্ত্রের একটী বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধতন্ত্রের মতে শূন্যতা ও করুণার সংমিশ্রণকে অন্বয় কহে। জলেতে লবণের সংমিশ্রণের ন্যায় এই অন্বয়কে তুলনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রের ধ্যানবিধি অতি চমৎকার। হৃদয়ের জ্যোতির্ম্ময় পদ্মে দেবী আর্য্যতারার ধ্যান করিতে হয়। পরে ভাবিতে হয়, সেই দেবীশরীরস্থ জ্যোতিঃতে সাধকের শরীরস্থ লোমকূপ হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে এবং সেই জ্যোতিঃ জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। শেষে ভাবিতে হয়, ধ্যেয় দেবী বিশ্বের সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন। বৌদ্ধতন্ত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধক নিজেকে ও অপরকে স্বভাবশুদ্ধ, নিত্যপূত জ্ঞান করিবেন। নিজের বা অপরের সম্বন্ধে অপবিত্রতাকে আদৌ স্থান দিবেন না। উপরি উক্ত ধ্যেয়া দেবী আর্য্যতারার পরিবর্ত্তে ভগবতী বা অন্য দেবীর ধ্যান করাও চলে। ধ্যানশেষে সাধক ভাবিবেন, তিনি ভগবতী হইয়া গিয়াছেন, এবং এই জগৎ সেই ভগবতীর অভিন্নরূপ।

বৌদ্ধতন্ত্রে দেবদেবীর সংখ্যা অসংখ্য। সংখ্যাতীত বৌদ্ধ দেবীর উদ্ভব এই ভাবে হইয়াছে। মহাশূন্য হইতে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা— অক্ষোভ্য, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি। বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান প্রত্যেক ধ্যানী বুদ্ধের সহিত এক একটি শক্তি সংযুক্ত

করিয়াছেন। প্রত্যেক ধ্যানী বুদ্ধ পাঁচ স্কন্ধের প্রতিমূর্ত্তি বা প্রভু। যথা— বিজ্ঞানের অধীশ্বর অক্ষোভ্য, রূপের অধীশ্বর বৈরোচন, বেদনার প্রভু রত্নসম্ভব, সংজ্ঞার প্রভু অমিতাভ এবং সংস্কারের প্রভু অমোঘ সিদ্ধি। শূন্য হইতে প্রথম বীজমন্ত্র, বীজমন্ত্র হইতে বিম্ব, পরে বিম্ব হইতে দেবদেবীর মূর্ত্তি আসিয়াছে। জম্ভল, যামরী ও মহাকাল প্রভৃতি রুদ্রমূর্ত্তি দেবদেবীর সম্বন্ধে বৌদ্ধতন্ত্র বলেন যে, তাঁহাদের অন্তর করুণাময়, কেবল জীবকল্যাণের নিমিত্ত এই বহিরুগ্র রূপ। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ঘোর বিদ্বেষ ছিল। তাঁহারা অধিকাংশ বৌদ্ধ দেবদেবীর পদতলে হিন্দু দেবদেবীকে রাখিয়াছেন, কাহাকেও বা দ্বারপাল, কাহাকেও বা সেবকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধগণ হিন্দুদের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারও করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম ও শিল্প প্রথমে গান্ধার দেশে কেন্দ্রীভূত হয়। পরে মথুরা, তৎপরে মগধ ও শেষে বাংলাদেশে মিলিত হয়। আর্য্য সভ্যতা যেমন প্রথম আর্য্যাবর্ত, পরে ব্রহ্মাবর্ত, পরে বৃন্দাবন, তৎপরে অযোধ্যা, তৎপরে নবদ্বীপ প্লাবিত করিয়া গঙ্গার স্রোতের সহিত প্রবাহিত হইয়া বাংলায় কেন্দ্রীভূত হয়, বৌদ্ধতন্ত্রও তদ্রূপ। বাংলার এক অভিনব সংস্কৃতি আছে—সমগ্র জগৎ, এমন কি, সমগ্র ভারত হইতে উহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

উপরি উক্ত পাঁচটি সশক্তিক ধ্যানী বুদ্ধ হইতে পাঁচটি দেবদেবীর কূল সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—দ্বেষ, মোহ, রাগ, চিন্তামণি ও সময়। এই সমস্ত দেবদেবীর কাহারও কাহারও দুই বা চার বা ছয় হইতে চব্বিশটি পর্য্যন্ত হাত এবং এক, দুই, তিন হইতে বারটি পর্য্যন্ত মস্তক আছে। বজ্রযান প্রধানতঃ বাংলাদেশে সমৃদ্ধ বলিয়া উহা বাংলা হইতে জাভা প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। হিন্দুতন্ত্রের একেশ্বরবাদের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র আদিবুদ্ধ বজ্রধর নামক এক দেবীর সৃষ্টি করেন—যাহা হইতে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের

উদ্ভব হইয়াছে। আদিবুদ্ধকে হৃদয়পদ্মস্থ নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার সহিত তুলনা করা হয়। প্রত্যেক ধ্যানী বুদ্ধকে পদ্মাসনোপরি সমাসীন কল্পনা করা হয়। অক্ষোভ্য ধ্যানী বুদ্ধের বর্ণ নীল, মুদ্রা ভূস্পর্শ, বাহন হস্তী ও বজ্রযুক্ত কর। বৈরোচনের বর্ণ শ্বেত, মুদ্রা ধর্মচক্র, বাহন রাক্ষস, চক্রহস্ত। অমিতাভের রং লাল, মুদ্রা সমাধি, বাহন ময়ুর, পদ্ম-হস্ত। রত্নসম্ভবের বর্ণ হরিদ্রা, মুদ্রা বরদ, অশ্ব বাহন, মণিহস্ত। অমোঘ-সিদ্ধের বর্ণ হরিৎ, অভয় মূদ্রা, গরুড় বাহন, বিশ্ববজ্রহস্ত।

অক্ষোভ্যের শক্তি লোচনা। অক্ষোভ্য দ্বেষকুলের হেরুক। হয়গ্রীব, যামরী ও বজ্রপাণি দেবগণপ্রধান। একজটা ও নৈরাত্মা এই দেবীদ্বয় এই কুলের শক্তি। বৈরোচনের শক্তি বজ্রধাত্রীশ্বরী। ইনি মোহকুলের প্রধান। ইহার দেবদেবী হইতেছেন, মারীচি, বজ্রবরাহী ও সুমন্তভদ্র। অমিতাভের শক্তি পাণ্ডারা। ইহার রাগকুল হইতে বোধিসত্ত্ব অবলো-কিতেশ্বর ও কুরুকুল্লার সৃষ্টি। সিংহনাদ অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি করুণাময়। এমন সৌম্য ও সুন্দর মূর্ত্তি বৌদ্ধ 'পান্থিয়নে' বিরল। রত্নসম্ভবের শক্তি যামকী। ইহার চিন্তামণি কূল হইতে জম্ভল ও বসুধারা প্রভৃতির উদ্ভব হয়। ধ্যানী বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের শক্তির নাম আর্য্যাতারা। ইহা হইতে বোধিসত্ত্ব বিশ্বপাণি, খদিরাবানীতারা ও পর্ণশবরী প্রভৃতির উদ্ভব।

নয়

বেদান্তে শক্তিবাদ

শঙ্করব্যাখ্যাত অদ্বৈতবেদান্তে শক্তিবাদ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য শক্তিতত্ত্বের যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা তন্ত্র-সম্মত। তিনি ব্রহ্মশক্তি ও জড়শক্তি উভয়ই স্বীকারপূর্বক কি ভাবে মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তন্ত্রমতে শক্তি সত্য ; বেদান্তমতে মায়া মিথ্যা। শক্তিবাদ ও মায়াবাদের সমন্বয় সাধন শঙ্কর-প্রতিভার অমৃত ফল।

ব্রহ্মজ্ঞানীকেও শক্তি স্বীকার করিতে হয় ; তাহার প্রমাণ রামকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য্য ও তোতাপুরী। ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী জীবন্মুক্ত হইয়াও শিষ্যের সংস্পর্শে আসিয়া শক্তি স্বীকার করিলেন। শিষ্যের নিকট গুরু যে শিক্ষা-লাভ করিলেন তাহা ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একটি অভিনব ঘটনা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভান্তে শঙ্কর যখন কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি শক্তি মানিতেন না। কাশীপুরাধিশ্বরী অন্নপূর্ণা অপূর্ব কৌশলে এই সত্য শঙ্করকে শিক্ষা দিলেন। তথায় সশিষ্য শঙ্করের কয়েক দিন ভিক্ষা মিলিল না। তাঁহারা শারীরিক দৌর্বল্যহেতু চলৎশক্তি-রহিত হইয়া এক স্থানে পড়িয়া রহিলেন। তখন কৃপাসাগরী মাতা অন্নপূর্ণা সাধারণ নারীর বেশে তাঁহাদের সমীপে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে মহাশক্তি স্বীকার করাইলেন। বেদান্তকেশরী ব্রহ্মশক্তি মানিলেন। শঙ্কর যে কত বড় শাক্ত ছিলেন তাহা তদ্রচিত বহু দেবীস্তোত্রাদি হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। প্রবাদ আছে যে. প্রপঞ্চসার তন্ত্রখানি তাঁহারই রচনা। তাঁহার 'সৌন্দর্য্যলহরী' শক্তিরহস্যের

উজ্জ্বল ব্যাখ্যা। কোন কোন স্থানে শক্তিকে তিনি শিবের উপরেও স্থান দিয়াছেন। তাঁহার 'দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রে' আছে "কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং। ভবানি তৎপাণি-গ্রহণ-পরিপাটি ফলমিদং॥" অর্থাৎ মহাদেব যে জগদীশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা ভবানীর পাণিগ্রহণরূপ নৈপুণ্যনিমিত্ত। 'সৌন্দর্য্যলহরীর প্রথম শ্লোকটি এই—"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্ত প্রভাবিতুম্। ন চেদেবং দেবোখলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।" অর্থাৎ শিব শক্তিযুক্ত হইয়াই সৃজনে সমর্থ হন; শক্তিরহিত হইলে তিনি স্পন্দনেও অসমর্থ।

বাদরায়ণ তাঁহার বেদান্তসূত্রের দুই স্থানে শক্তি শব্দটীর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা (১) অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ (২-২-৯), এবং (২) শক্তিবিপর্য্যয়াৎ (২-৩-৩৮)। এই দুইটী সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—বুদ্ধি করণমাত্র, কদাপি কর্তা নহে; জীবই কর্ত্তা। তিনি বলেন, "করণশক্তিবুদ্ধেঃ হীয়তে কর্ত্তৃশক্তিশ্চাপদ্যতে।" অর্থাৎ বুদ্ধি করণশক্তিহীন এবং কর্তৃত্বশক্তি প্রাপ্ত হইলে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বুদ্ধি জীবের করণমাত্র। শঙ্করমতে "কর্তা শক্তোঽপি সন্ করণমুপাদায় ক্রিয়াসু প্রবর্তমানো দৃশ্যতে।' অর্থাৎ কর্ত্তা শক্তিমান হইলেও করণ গ্রহণপূর্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। জীব কর্তা হইয়াও বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন। কর্তৃশক্তি এবং করণশক্তি ব্যতীত শঙ্কর আরও অনেক প্রকার শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা— দৃক্শক্তি, সর্গশক্তি, প্রবৃত্তিশক্তি, বীজশক্তি, দহনশক্তি, জ্ঞান-শক্তি ইত্যাদি। তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২.২-৭) আছে— "কশ্চিৎ পুরুষো দৃক্শক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিহীনঃ।" কোন পুরুষের দৃকশক্তি আছে; কিন্তু প্রবৃত্তিশক্তি নাই। বীজশক্তির বিষয় আচার্য্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'বীজশক্ত্যবস্থম্ অব্যক্তশব্দযোগ্যং।' নামরূপ সৃষ্টির পূর্বে জগৎ

অব্যক্ত অবস্থায় ছিল ; বটবৃক্ষ বটবীজে যেমন সূক্ষ্মরূপে থাকে, অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থার প্রাপ্তিই সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টি শক্তির বিকাশ মাত্র। একটী ক্ষুদ্র ধূলিকণা হইতে বিশাল সূর্য্য পর্য্যন্ত বিশ্বের সকল বস্তুর শক্তি আছে। ইহা শুধু দার্শনিক সত্য নহে, বৈজ্ঞানিক সত্যও বটে। আনবিক বোমা প্রমাণ করিয়াছে, ক্ষুদ্রতম অনুর মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত। হোমিওপ্যাথি দেখাইয়াছে, দ্রব্যের স্থূলাংশ যতই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, ততই উহা শক্তীকৃত হয়। কণামাত্র ঔষধকে কোটীতম অংশে বিভক্ত করিলেও উহার শক্তি বৃদ্ধি হয়। বালুকণা হইতে হোমিওপ্যাথি সাইলিসিয়া নামক যে ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছে তাহার অদ্ভুত রোগারোগ্য শক্তি আছে। সামান্য লবণকণা হইতে প্রস্তুত নেট্রম মিউর নামক হোমিও ঔষধ কুষ্ঠাদি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারে। আচার্য্য শঙ্কর মণি, মন্ত্র, ঔষধাদির শক্তিতেও বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেন, "লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে।" অর্থাৎ স্থান, সময় ও কারণভেদে মণি, মন্ত্র ও ঔষধি প্রভৃতি লৌকিক দ্রব্যের অনেক বিরুদ্ধ শক্তি দৃষ্ট হয়।

সাধারণ বস্তুর যখন এত অধিক শক্তি তখন ঈশ্বরের শক্তি কত বেশী তাহা মানববুদ্ধি ধারণা করিতে পারে না। বেদান্ত দর্শনের 'রত্নপ্রভা' টীকাতে আছে, "যদা লৌকিকানাং প্রত্যক্ষদৃষ্টানামপি শক্তিরচিন্ত্যা তদা শব্দৈকসমধিগমস্য ব্রহ্মণঃ কিম্ বক্তব্যম্।" যখন লৌকিক প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুর শক্তি অচিন্ত্য তখন প্রণববাচ্য ব্রহ্মের শক্তি যে অপরিমেয় তাহা বলা বাহুল্য। বেদান্ত দর্শনের অন্যান্য ভাষ্যকারগণও মুক্তকণ্ঠে ব্রহ্মশক্তি স্বীকার করিয়াছেন। মাধ্বাচার্য্য বলেন, "পরমাত্মনো বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ স্যুঃ। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ।" পরমাত্মার বিচিত্র শক্তিসমূহ আছে।

পুরাণ পুরুষ ব্রহ্ম বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন; অন্যের শক্তি তাদৃশ অসীম নহে।

শঙ্করের মতে অবিদ্যা শক্তি অচেতন, জগদ্বীজ ও ঈশ্বরাধীন; ঈশ্বরের সাহায্যে এই অচেতন শক্তি জগৎ সৃষ্টি করে। বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করভাষ্যের ভামতী টীকাতে লিখিয়াছেন—"ন হি অচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং কার্য্যায় পর্য্যাপ্তমিতি।" চেতন শক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে অচেতন শক্তি কার্য্যক্ষম হয় না। শাঙ্কর বেদান্তে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ স্বীকৃত। সেই জন্য শঙ্কর বলেন, "তত্রৈবং সতি যথাগ্নিস্ফুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহনপ্রকাশনশক্তী ভবতঃ, এবং জীবেশ্বরয়োরপি জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তী।" জীব ও ঈশ্বর অভেদ বলিয়া অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের যেমন শক্তি ও প্রকাশন শক্তি সমান, তদ্রূপ জীব ও ঈশ্বরের, জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্য্যশক্তি সমান। কিন্তু ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবৃত। মায়ার প্রভাব ঈশ্বরে নাই। আর জীব মায়াধীন; মায়ার প্রভাবে অভিভূত। এই কারণে জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তি সুপ্ত থাকে। বেদান্ত দর্শনে আছে, "বিদ্যমানমপিতু তৎ তিরোহিতম্ অবিদ্যাব্যবধানাৎ দেহযোগাৎ বা সোঽপি।" জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও উহা অবিদ্যার প্রভাবে বা দেহধারণ নিমিত্ত তিরোহিত থাকে। সৎকার্য্যবাদ এবং কার্য্যকারণের একত্ব সমর্থন করিয়া শঙ্কর কারণের কার্য্যরূপে প্রকাশকেই শক্তি বলিয়াছেন। তাঁহার উক্ত ভাব প্রকাশক বাক্যটী এই—"শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যা (কার্য্যকারণাভ্যাম্)।" কার্য্য ও কারণ উভয়ই শক্তির স্থূল প্রকাশ মাত্র। সুতরাং একটীকে অপরটী হইতে পৃথক করা ভুল। কারণ মাত্রই শক্তিমান্। যাহাতে কার্য্যরূপে ব্যক্ত হইবার শক্তি নাই তাহা কারণ নহে। উক্ত বিষয়ে শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই—"কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চ আত্মভূতং কার্য্যম্।" শক্তিই কারণের আত্মা এবং যাহা কার্য্যরূপে প্রকাশিত হয় তাহা শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। কার্য্যে পরিণত হইবার সাধারণ শক্তিই কারণত্ব নামে অভিহিত হয়। কার্য্য এবং কারণ উভয়ই

শক্তির বিকাশভেদ মাত্র। কারণের কার্য্যে পরিণতি শক্তির বিকাশভেদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

এবার আমরা বেদান্তে শক্তিবাদের প্রধান বিষয়টী আলোচনা করিব। বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মকে শক্তিমান্‌রূপে সর্বদা বর্ণনা করিয়াছেন। শঙ্করমতে 'সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম'; সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি; তস্য মহতো ভূতস্য নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বং চেতি।' অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিযুক্ত। সর্বশক্তি কারণস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগঃ সৃষ্ট হয়। সেই মহাভূত ব্রহ্মের নিরতিশয় সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্ব আছে। আর এক স্থানে শঙ্কর ব্রহ্মকে অপরিমিত ও পরিপূর্ণশক্তি বলিয়াছেন। তাঁহার তদর্থসূচক বাক্যটী যথা— "যদি অপি অস্মাকম্ ইয়ং জগদ্বিম্বরচনা গুরুতর সংরম্ভ ইব আভাতি তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলা এব কেবলা ইয়ম্ অপরিমিতশক্তিত্বাৎ।" যদিও মানুষের নিকট এই জগৎসৃষ্টি অতীব কঠিন ব্যাপাররূপে প্রতীত হয় তথাপি পরমেশ্বরের নিকট ইহা লীলামাত্র; কারণ তাঁহার শক্তি অপরিমিত। ঈশ্বরের শক্তির সীমা নাই। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্ত্বের অর্থ—ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ উভয়ই। শঙ্কর ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্ত্ব হইতে সর্বজ্ঞত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ বলিয়া তাঁহার পরিপুর্ণ শক্তির জ্ঞানপ্রতিবন্ধ, শক্তিপ্রতিবন্ধ বা অন্য কোনও প্রকার প্রতিবন্ধ নাই। শক্তিবাদের দৃষ্টিতে জ্ঞানও এক প্রকার শক্তি। বেদান্তসূত্রে (২-২-৯) ইহা সুব্যক্ত। জ্ঞান ও ক্রিয়া ঈশ্বরের স্বভাব। আবার জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির বিকাশমাত্র। সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম শক্তিস্বরূপ। ব্রহ্ম বিবিধ বিচিত্র শক্তির অধিষ্ঠান। তাঁহার সমান বা সমধিক কেহ নাই। তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত ও অনতিক্রান্ত। শঙ্করের শক্তিবাদ কোন কোন উপনিষদ্ কর্তৃক সমর্থিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—'পরস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী

জ্ঞানবলক্রিয়া চ। য একো বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থে দধাতি।” ঈশ্বরের পরা শক্তি বিবিধ এবং তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও কার্য্য স্বাভাবিক। তিনি বিবিধ শক্তিযুক্ত বলিয়া এক হইতে বহু সৃষ্টি করেন। এই ভাবটী শঙ্কর বেদান্তসূত্রভাষ্যে (২-১-৩০) এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—“একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ উপপদ্যতে বিচিত্রঃ বিকারপ্রপঞ্চঃ।” এক ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তি থাকায় বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ভূত হয়। ঈশ্বর এক হইয়াও অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে বহুরূপ ধারণ করেন। সব কিছুই ঐশী শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়। এমন কিছু এই জগতে নাই যাহা তদ্ব্যতীত সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়াদিও ব্রহ্মশক্তি ব্যতীত স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদনে অসমর্থ। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৪-৪-১৮) শঙ্কর-ভাষ্যে আছে—“ব্রহ্মশক্ত্যধিষ্ঠিতানাং হি চক্ষুরাদীনাং দর্শনাদি সামর্থ্যম্।” চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ব্রহ্মশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই দর্শনাদিতে সমর্থ হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিসম্বন্ধে উপনিষদের ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিয়াছেন।

কিরূপে জানা যায় যে, ঈশ্বরের এইরূপ অদ্ভুত শক্তি আছে? শঙ্কর বেদান্ত-সূত্রভাষ্যে (২-১-৩০) বলেন, “তৎপুনঃ উপগম্যতে বিচিত্র শক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্ম ইতি। তৎ উচ্যতে সর্ব্বোপেতা চ তৎ দর্শনাৎ।” অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা উপনিষদাবলী কর্তৃক কীর্তিত; সুতরাং বিশ্বাসার্হ। যিনি অদ্ভুত শক্তিযুক্ত তিনিই এই বিচিত্র জগৎ সৃজনে সমর্থ, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে আমরা এই বিশ্বরচনার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারি না। যে আশ্চর্য ভাব এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদের মনে উদ্দীপিত করে তাহার কারণ সামান্য বস্তু হইতে পারে না। ইহা নিশ্চয়ই পরমেশ্বরের লীলা। পরমেশ্বর তাঁহার অপরিমিত শক্তির দ্বারা এই বিশ্বরচনা করিয়াছেন। বেদান্তমতে ব্রহ্ম সকল কারণ-ধর্মযুক্ত: সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ এবং মহামায়া। জ্ঞান, শক্তি এবং মায়ার

বলে ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ। মায়াও ব্রহ্মের এক প্রকার শক্তি। উদয়নাচার্য তাঁহার 'কুসুমাঞ্জলি'তে (১-২০) বলেন, "মায়া ঈশ্বরের সহকারী শক্তি। এই শক্তি সহায়ে ঈশ্বর বিশ্বসৃজনে সমর্থ।" বৌদ্ধমতে অবিদ্যা এক প্রকার বাসনা এবং সেই বাসনাকে শক্তি বলে। 'তত্ত্বসংগ্রহ' পুস্তকের টীকাতে কমলশীল বলেন, "অস্মাকং তুবিততাভিনিবেশবাসনা এব অবিদ্যা। সা চ বাসনা শক্তি উচ্যতে।"

গীতামতে মায়া ঈশ্বরের শক্তি। গীতাতে আছে, "দৈবীহি এষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া।" অর্থাৎ মায়াশক্তি ঐশী, ত্রিগুণময়ী এবং দুরতিক্রম্যা। অদ্বৈত বেদান্তে মায়াশক্তি অবিদ্যা নামে কথিত। মায়া ব্যতীত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় অসম্ভব। মায়াই বিশ্ব-বৈচিত্র্যের কারণ। শঙ্কর বলেন, "নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্তি-অসম্ভবাৎ।" অর্থাৎ মায়াশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না, শক্তিশূন্য ব্রহ্মের প্রবৃত্তি অসম্ভব। শঙ্করমতে ব্রহ্ম "দ্বিরূপং হি অবগম্যতে। নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টম্, তদ্‌বিপরীতংচ সর্বোপাধিবিবর্জিতম্।" অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই রূপ উপলব্ধ হয়—নাম, রূপ, বিকার ও ভেদরূপ উপাধিযুক্ত সগুণ ব্রহ্ম এবং তৎবিপরীত সকল উপাধিরহিত নির্গুণ ব্রহ্ম। নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম শক্তিসমন্বিত না হইলে বিশ্বকারণ হইতে পারেন না। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রে আছে, 'জন্মাদি অস্য যতঃ।' জগতের জন্মাদির কারণ সগুণ ব্রহ্ম। উপনিষদের উক্তি অনুসারে শঙ্কর একাধিকবার ব্রহ্মকে মহামায়া বা মায়াবী বলিয়াছেন। মায়াবী অর্থে মায়াযুক্ত।

সাংখ্যের প্রকৃতি এবং বেদান্তের মায়া এক নহে। ইহা বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে (১ ৪-৩) স্পষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সাংখ্যের প্রকৃতি জড়া এবং পুরুষের কৈবল্যাবস্থাতেও বিদ্যমানা। বেদান্তের মায়া স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই অন্তর্হিতা হন। মায়া অনির্বচনীয়া।

শঙ্কর বলেন, "সদসদভ্যাম্ অনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী। অব্যক্তাহি সা মায়া তত্বান্যত্বনিরূপণস্ত অশক্যত্বাৎ।" মায়া অনাদি, সান্তা, মিথ্যা। ইহা সৎ কি অসৎ তাহা বাক্যে বলা যায় না, ইহা অব্যক্তা। তত্ত্বজ্ঞান-ব্যতীত অন্য উপায়ে ইহার নাশ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞের উপর মায়ার কোন প্রভাব নাই। অজ্ঞ মায়ার প্রভাবাধীন। যেমন অগ্নি সকল কাষ্ঠকে ভস্মীভুত করে তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান মায়াশক্তিকে বিনষ্ট করে। ভামতীর মতে অবিদ্যাশক্তি ঈশ্বরাধীন এবং ঈশ্বরাশ্রয়ী। ঈশ্বরকৃপাতেও মানুষ মায়ার প্রভাব হইতে মুক্তি পাইতে পারে। শঙ্কর সত্যই বলিয়াছেন, "পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিঃ যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতা শেরতে সংসারিণ্যঃ জীবাঃ।" অর্থাৎ সংসারী জীবগণ মায়াজালে আবদ্ধ। মায়ার প্রভাবে তাহারা আত্মস্বরূপের জ্ঞান বিস্মৃত এবং অজ্ঞানরূপ সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। মায়ামুক্ত জীব শিব। মায়াবদ্ধ শিব জীব। মায়ার প্রভাবে শিব জীবত্ব প্রাপ্ত হন। মায়ামুক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। ওঁ তৎ সৎ।

সমাপ্ত

স্বামী জগদীশ্বরানন্দের বাংলা গ্রন্থাবলী

কয়েকখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা